দায়িত্বে রয়েছে। এতে নির্দেশ রয়েছে যে, ক্ষমা করাই উত্তম। পরবর্তী দু'আয়াতে এরই আরও বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

ক্ষমা ও প্রতিশোধ গ্রহণে সুষম ফয়সালা ঃ হযরত ইবরাহীম নখয়ী (র) বলেন, পূর্ববর্তী মনীষিগণ এটা পছন্দ করতেন না যে, মু'মিনগণ পাপাচারী লোকদের সামনে নিজেদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করবেন। ফলে তাদের ধৃষ্টতা আরও বেড়ে যাবে। তাই যেক্ষেত্রে ক্ষমা করার ফলে পাপাচারীদের ধৃষ্টতা বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে, সেক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেওয়াই উত্তম। ক্ষমা করা তখন উত্তম, যখন অত্যাচারী ব্যক্তি অনুতপ্ত হয় এবং তার পক্ষ থেকে অত্যাচার বেড়ে যাওয়ার আশংকা না থাকে। কাযী আবূ বকর ইবনে আরাবী ও কুরতুবী এ নীতিই পছন্দ করেছেন। তাঁরা বলেন, ক্ষমা ও প্রতিশোধ দু'টিই অবস্থাভেদে উত্তম। যে ব্যক্তি অনাচার করার পর লজ্জিত হয়, তাকে ক্ষমা করা উত্তম এবং যে ব্যক্তি স্বীয় জেদে ও অত্যাচারে অটল থাকে, তার ক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেওয়াই উত্তম।

বয়ানুল কোরআনে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য দু'আয়াতে খাঁটি মু'মিন ও সৎকর্মীদের দু'টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। هُمْ يَغْفِرُوْنَ—এ বাক্যে বলা হয়েছে যে, তারা ক্রোধের সময় নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলে না ; বরং তখনও ক্ষমা ও অনুকম্পা তাদের মধ্যে প্রবল থাকে। ফলে ক্ষমা করে দেয়। পক্ষান্তরে هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ----বাক্যে বলা হয়েছে যে, কোন সময় অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের প্রেরণা তাদের মধ্যে জাগ্রত হলেও তারা তাতে ন্যায়ের সীমালংঘন করে না, যদিও ক্ষমা করে দেওয়া উত্তম।

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ۭ وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ
لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ ۝
وَتَرٰىهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ
خَفِيٍّ ۭ وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ
وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ اَلَآ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ۝
وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَاۗءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ وَمَنْ

حَفِيْظًا ۭ اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ۭ وَاِنَّآ اِذَآ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا
رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ
الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ ۝ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ يَخْلُقُ مَا يَشَاۗءُ ۭ
يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاۗءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاۗءُ الذُّكُوْرَ ۝ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ
ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاۗءُ عَقِيْمًا ۭ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝
يُضِلِّ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ ۝ اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ
قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ۭ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَىِٕذٍ
وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ ۝ فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ

(৪৪) আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য তিনি ব্যতীত কোন কার্যনির্বাহী নেই। পাপাচারীরা যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন আপনি তাদেরকে দেখবেন যে, তারা বলছে 'আমাদের ফিরে যাওয়ার কোন উপায় আছে কি?' (৪৫) জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করার সময় আপনি তাদেরকে দেখবেন, অপমানে অবনত এবং অর্ধ নিমীলিত দৃষ্টিতে তাকায়। মু'মিনরা বলবে, কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত তারাই, যারা নিজেদের ও তাদের পরিবার-পরিজনের ক্ষতি সাধন করেছে। শুনে রাখ, পাপাচারীরা স্থায়ী আযাবে থাকবে। (৪৬) আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না, যে তাদেরকে সাহায্য করবে। আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার কোন গতি নেই। (৪৭) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবশ্যম্ভাবী দিবস আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য কর। সেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তা নিরোধকারী কেউ থাকবে না। (৪৮) যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনাকে আমি তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। আপনার কর্তব্য কেবল প্রচার করা। আমি যখন মানুষকে আমার রহমত আস্বাদন করাই, তখন সে উল্লসিত হয়, আর যখন তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের কোন অনিষ্ট ঘটে, তখন মানুষ খুব অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। (৪৯) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্রই। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন, (৫০) অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশালী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এটা ছিল হিদায়তপ্রাপ্তদের অবস্থা। তারা দুনিয়াতে হিদায়ত এবং পরকালে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সওয়াব পাবে। এবার পথভ্রষ্টদের অবস্থা শোন,) আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত (দুনিয়াতেও) কোন কার্যনির্বাহী নেই (যে, তাকে সৎপথে নিয়ে আসবে) এবং (কিয়ামতেও তার অবস্থা হবে শোচনীয়। সেমতে সেদিন) পাপাচারীরা যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে, আপনি তখন তাদেরকে (পরিতাপ সহকারে) বলতে দেখবেন, "আমাদের (দুনিয়াতে) ফিরে যাওয়ার কোন উপায় আছে কি (যাতে ভাল কাজ করে আসতে পারি)"? (এছাড়া) আপনি দেখবেন, যখন তাদেরকে জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করা হবে, তখন অপমানে অবনত থাকবে এবং অর্ধ নিমীলিত দৃষ্টিতে তাকাবে (ভয়ার্ত মানুষ যেমন তাকায়)। (অন্য এক আয়াতে অন্ধ হওয়ার কথা আছে। সেটা হবে হাশরে আর এটা তার পরের ঘটনা। সেখানে نحشره বলা হয়েছে। তখন) মু'মিনরা (নিজেদের পরিত্রাণ প্রাপ্তির কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এবং জাহান্নামীদেরকে তিরস্কার করার উদ্দেশ্যে) বলবে, পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের ও তাদের পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে (আজ) কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। (সূরা যুমারের দ্বিতীয় রুকূতে এর তফসীর বর্ণিত হয়েছে।) মনে রেখো, জালিমরা (অর্থাৎ মুশরিক ও কাফিররা) স্থায়ী আযাবে থাকবে। (সেখানে) তাদের আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সাহায্যকারী থাকবে না যে তাদেরকে সাহায্য করবে। আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার (মুক্তির) কোন গতি নেই। (অতপর কাফিরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে যে, তোমরা যখন কিয়ামতের এই ভয়াবহ অবস্থা শুনলে, তখন) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (ঈমান ইত্যাদি সম্পর্কিত) আদেশ মান্য কর সে দিবস আসার পূর্বে, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অপসারিত হবে না (অর্থাৎ দুনিয়াতে যেমন আযাব অপসারিত হয় পরকালে তেমন পরিস্থিতি হবে না।) সেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তোমাদের সম্পর্কে কোন নিরোধকারীও থাকবে না। (অর্থাৎ তোমাদের দুর্গতির কারণ জিজ্ঞাসাকারীও কেউ থাকবে না।) হে পয়গম্বর, আপনি তাদেরকে এ কথা শুনিয়ে দিন। অতপর (একথা শুনেও) যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, (এবং ঈমান না আনে), তবে (আপনি চিন্তিত ও দুঃখিত হবেন না। কেননা,) আমি আপনাকে তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি (যে, আপনি জিজ্ঞাসিত হবেন তারা আপনার উপস্থিতিতে এরূপ কেন করল? বরং) আপনার কর্তব্য হল কেবল প্রচার করা (যা আপনি করে যাচ্ছেন। কাজেই আপনি এর বেশি চিন্তা করবেন কেন? সত্যের প্রতি তাদের বিমুখ হওয়ার কারণ আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের অভাব। এর লক্ষণ এই যে,) আমি যখন (এ ধরনের) মানুষকে আমার রহমত আস্বাদন করাই তখন সে (অহংকারে) উৎফুল্ল হয় (এবং রহমত দাতার শোকর করে না)। আর যদি তাদের কুকর্মের কারণে কোন বিপদ ঘটে, তখন (এ ধরনের) মানুষ অকৃতজ্ঞ হয়ে যায় (এবং তওবা ও ইস্তেগফার করে আল্লাহ্‌র অভিমুখী হয় না। এই উভয় অবস্থাই এ বিষয়ের লক্ষণ যে, তাদের সম্পর্ক আল্লাহ্‌র সাথে নেই অথবা দুর্বল। এ কারণেই তারা কুফরে

লিপ্ত হয়েছে। যেহেতু এটা তাদের মজ্জায় পরিণত হয়ে গেছে, তাই তাদের কাছ থেকে ঈমান আশা করবেন না। অতপর আবার তওহীদ বর্ণিত হয়েছে)—নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্ তা'আলারই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। (সেমতে) যাকে ইচ্ছা, কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন অথবা তাদেরকে পুত্র ও কন্যা উভয়ই দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য প্রাথমিক আয়াতসমূহে তাদের পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে, যারা মু'মিন সৎকর্মীদের বিপরীতে কেবল দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তি কামনা করে। এরপর اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ —বাক্যে তাদেরকে কিয়ামতের আযাব আসার পূর্বে তওবা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দেওয়া হয়েছে যে, আপনার বারংবার প্রচার ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি তাদের চৈতন্য ফিরে না আসে, তবে আপনি দুঃখিত হবেন না। فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا —বাক্যের মর্ম তাই।

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ —থেকে শেষ পর্যন্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা বর্ণনা করে তওহীদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির আলোচনার পর يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ বলে কুদরতের একটি বিধি বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি প্রত্যেক ছোট বড় বস্তু সৃষ্টি করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং যখন ইচ্ছা, যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। এ প্রসঙ্গে মানব সৃষ্টির উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ

يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ -

অর্থাৎ মানব সৃষ্টিতে কারও ইচ্ছা, ক্ষমতা এমনকি, জ্ঞানেরও কোন দখল নেই। পিতামাতা মানব সৃষ্টির বাহ্যিক মাধ্যম হয়ে থাকে মাত্র। সন্তান প্রজননে তাদের ইচ্ছা ও ক্ষমতারও কোন দখল নেই। দখল থাকা তো দূরের কথা, সন্তান জন্মগ্রহণের পূর্বে মাতাও জানে না যে, তার গর্ভে কি আছে এবং কিভাবে গঠিত হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'আলাই

কাউকে কন্যা সন্তান, কাউকে পুত্র সন্তান, কাউকে পুত্র-কন্যা উভয়ই দান করেন এবং কাউকে সম্পূর্ণ বন্ধ্যা করে রাখেন—তার কোন সন্তানই হয় না।

এসব আয়াতে সন্তানের প্রকার বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম কন্যা সন্তানের উল্লেখ করেছেন, আর পুত্র সন্তানের উল্লেখ করেছেন পরে। এ ইঙ্গিতদৃষ্টে হযরত ওয়াছেলা ইবনে আসকা' বলেন, যে নারীর গর্ভ থেকে প্রথমে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে পুণ্যময়ী। —(কুরতুবী)

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ
اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ۭ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ۝۵۱
وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ۭ مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتٰبُ
وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِيْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۭ
وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝۵۲ صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ اَلَآ اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ ۝۵۳

(৫১) কোন মানুষের জন্য এমন হওয়ার নয় যে, আল্লাহ্ তার সাথে কথা বলবেন; কিন্তু ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে অথবা তিনি কোন দূত প্রেরণ করবেন, অতপর আল্লাহ্র যা চান, সে তা তাঁর অনুমতিক্রমে পৌঁছে দেবে। নিশ্চয় তিনি সর্বোচ্চ প্রজ্ঞাময়। (৫২) এমনিভাবে আমি আপনার কাছে এক ফেরেশতা প্রেরণ করেছি আমার আদেশক্রমে। আপনি জানতেন না, কিতাব কি এবং ঈমান কি। কিন্তু আমি একে করেছি নূর, যদ্দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করি। নিশ্চয় আপনি সরল পথ প্রদর্শন করেন—(৫৩) আল্লাহ্র পথ। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। শুনে রাখ, আল্লাহ্র কাছেই সব বিষয়ে পৌঁছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কোন মানুষের জন্য এমন নয় যে, (বর্তমান অবস্থায়) আল্লাহ তা'আলা তার সাথে কথা বলবেন, কিন্তু (তা তিন উপায়ে হতে পারে।) ইলহামের মাধ্যমে (অর্থাৎ অন্তরে কোন ভাল বিষয় জাগ্রত করে) অথবা যবনিকার অন্তরাল থেকে [কোন কথা শুনিয়ে; যেমন, মূসা (আ) শুনেছিলেন] অথবা তিনি কোন দূত ফেরেশতা প্রেরণ

করবেন এবং তিনি আল্লাহ্‌র আদেশক্রমে তিনি যা চান, তা পৌঁছে দেবেন। (এর কারণ এই যে,) তিনি সমুন্নত, (তিনি শক্তি না দিলে কেউ তাঁর সাথে বাক্যালাপ করতে পারে না। কিন্তু এতদসঙ্গে তিনি) প্রজ্ঞাময়। (এ কারণেই বান্দার সাথে তিনি বাক্যালাপের তিনটি উপায় নির্ধারিত করে দিয়েছেন। মানুষের সাথে আমার কথা বলার যেমন উপায় বর্ণনা করা হয়েছে,) এমনিভাবে (অর্থাৎ এই নিয়মানুযায়ী) আমি আপনার কাছেও ওহী (অর্থাৎ আমার) আদেশ প্রেরণ করেছি (এবং আপনাকে রসূল বানিয়েছি। এই ওহী এমন এক নির্দেশনামা যে, এরই বদৌলতে আপনার তুলনাবিহীন জ্ঞানের উন্নতি হয়েছে। সেমতে এর আগে) আপনি জানতেন না, (আল্লাহ্‌র) কিতাব কি এবং ঈমান (অর্থাৎ ঈমানের পূর্ণ স্তর, যা এখন অর্জিত আছে) কি? (যদিও মূল ঈমান নবুয়তের পূর্বেও নবীর জানা থাকে) কিন্তু আমি (আপনাকে নবুয়ত ও কোরআন দিয়েছি এবং) এ কোরআনকে (প্রথমে আপনার জন্য ও পরে অন্যদের জন্য) করেছি নূর (যদ্দ্বারা আপনার মহান জ্ঞান ও সুউচ্চ মর্যাদা অর্জিত হয়েছে এবং) যদ্দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করি। (সুতরাং এটা যে মহান নূর, এতে সন্দেহ নেই। এখন যে অন্ধ, সে এ নূরের উপকার থেকে বঞ্চিত, বরং একে অস্বীকার করে। যেমন, আপত্তিকারীদের অবস্থা।) নিঃসন্দেহে আপনি (এ কোরআন ও ওহীর মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে) সরল পথ প্রদর্শন করছেন, (অর্থাৎ) আল্লাহ্‌র পথ, সে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবকিছু যার। (অতপর এসব আদেশ যারা মানে এবং যারা মানে না, তাদের শাস্তি ও প্রতিদান উল্লেখ করা হয়েছে—) মনে রেখ, তাঁরই কাছে সব বিষয় পৌঁছবে (তখন তিনি সব কিছুর প্রতিদান ও শাস্তি দেবেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াত ইহুদীদের এক হঠকারিতামূলক দাবির জওয়াবে অবতীর্ণ হয়েছে। বগভী ও কুরতুবী প্রমুখ লিখেছেন, ইহুদীরা রসূলুল্লাহ্ (স)-কে বলল, আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না। কেননা, আপনি মূসা (আ)-র ন্যায় আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখেন না এবং তাঁর সাথে সামনাসামনি কথাবার্তাও বলেন না।

রসূলুল্লাহ্ (স) বললেন, একথা সত্য নয় যে, মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখেছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এর সারমর্ম এই যে, এ দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সরাসরি ও সামনাসামনি কথা বলা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। স্বয়ং হযরত মূসা (আ)-ও সামনাসামনি কথা শুনেন নি, বরং যবনিকার অন্তরাল থেকে আওয়ায শুনেছেন মাত্র।

এ আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, কোন মানুষের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার কথা বলার তিনটি মাত্র উপায় রয়েছে। এক—وَحْيًا—অর্থাৎ কোন বিষয় অন্তরে জাগ্রত করে দেওয়া। এটা জাগ্রত অবস্থায়ও হতে পারে এবং নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নের আকারেও

হতে পারে। অনেক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) اَلْقِىَ فِىْ رُوْعِىْ বলতেন। অর্থাৎ এ বিষয়টি আমার অন্তরে জাগ্রত করা হয়েছে। পয়গম্বরগণের স্বপ্নও ওহী হয়ে থাকে। এতে শয়তানের কারসাজি থাকতে পারে না। এমতাবস্থায় সাধারণত আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে শব্দ অবতীর্ণ হয় না; কেবল বিষয়বস্তু অন্তরে জাগ্রত হয়, যা পয়গম্বর নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেন।

দ্বিতীয় উপায়—اَوْ مِنْ وَّرَاۤئِ حِجَابٍ—অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় যবনিকার অন্তরাল থেকে কোন কথা শোনা। মূসা (আ) তুর পর্বতে এভাবেই আল্লাহ্ তা'আলার কথা শুনেছিলেন। কিন্তু তিনি আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাৎ লাভ করেন নি। তাই رَبِّ اَرِنِىْۤ اَنْظُرْ اِلَيْكَ বলে সাক্ষাতের আবেদন জানান, যার নেতিবাচক জওয়াব لَنْ تَرٰىنِىْ বলে দেওয়া হয়।

দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাতের অন্তরায় যবনিকাটি এমন কোন বস্তু নয়, যা আল্লাহ্ তা'আলাকে ঢেকে রাখতে পারে। কেননা, তাঁর সর্বব্যাপী নূরকে কোন বস্তুই ঢাকতে পারে না। বরং মানুষের দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতাই এ সাক্ষাতের পথে অন্তরায় হয়ে থাকে। জান্নাতে মানুষের দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে দেওয়া হবে। ফলে সেখানে প্রত্যেক জান্নাতী আল্লাহ্ তা'আলার দর্শন লাভে ধন্য হবে। সহীহ্ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী আহ্লে সুন্নত ওয়াল জমাআতের মযহাবও তাই।

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত এ নীতি দুনিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দুনিয়াতে কোন মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সামনাসামনি কথা বলতে পারে না। আলোচনা যেহেতু মানুষ সম্পর্কে, তাই আয়াতে বিশেষভাবে মানুষের উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা বাহ্যত ফেরেশতাগণের সাথেও আল্লাহ্ তা'আলার সামনাসামনি কথা হয় না। তিরমিযীর রেওয়ায়েতে জিবরাঈল (আ)-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, আমি অনেক কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম, তবুও আমার এবং আল্লাহ্ তা'আলার মধ্যে সত্তর হাজার পর্দা রয়ে গিয়েছিল। কোন কোন আলিমের উক্তি অনুযায়ী যদি মে'রাজ-রজনীতে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে রসূলুল্লাহ্ (স)-র মুখামুখি কথাবার্তা প্রমাণিত হয়, তবে তা উপরোক্ত নীতির পরিপন্থী নয়। কেননা, সে কথাবার্তা এ জগতে নয়—আরশে হয়েছিল।

তৃতীয় উপায়—اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا—অর্থাৎ জিবরাঈল প্রমুখ কোন ফেরেশতাকে কালাম দিয়ে প্রেরণ করা এবং পয়গম্বরকে তার পাঠ করে শোনানো। এটাই ছিল সাধারণ পন্থা। কোরআন পাক সম্পূর্ণই এ উপায়ে ফেরেশতার মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। উপরোক্ত বিবরণে وَحْىٌ শব্দটিকে অন্তরে নিক্ষেপ করার অর্থে নেওয়া

হয়েছে। কিন্তু শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আল্লাহ্‌র সব ধরনের কালামের অর্থে ব্যবহৃত হয়। বুখারীর এক দীর্ঘ হাদীসে ফেরেশতার মাধ্যমে কথাবার্তাকেও ওহীর একটি প্রকার গণ্য করা হয়েছে। তাতে আরও বলা হয়েছে যে, ফেরেশতার মাধ্যমে আগত ওহীও দু'রকম। কখনও ফেরেশতা আসল আকৃতিতে আসেন এবং কখনও মানুষের আকৃতিতে।

مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيْمَانُ——এ আয়াতটি প্রথম আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুরই পরিশিষ্ট। এর সারমর্ম এই যে, দুনিয়াতে মুখোমুখি কথাবার্তা তো কারও সাথে হয়নি---হতে পারেও না। তবে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ বান্দাদের প্রতি যে ওহী প্রেরণ করেন, তার তিনটি উপায় প্রথম আয়াতে বিবৃত হয়েছে। এই নিয়ম অনুযায়ী আপনার প্রতিও ওহী প্রেরণ করা হয়। আপনি আল্লাহ তা'আলার সাথে সামনাসামনি কথা বলুন----ইহুদীদের এ দাবি মূর্খতাপ্রসূত ও হঠকারিতামূলক। তাই বলা হয়েছে, কোন মানুষ এমনকি কোন রসূল যে জ্ঞান লাভ করেন, তা আল্লাহ্‌ তা'আলারই দান। যতক্ষণ আল্লাহ্‌ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তা ব্যক্ত না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত রসূলগণ কোন কিতাব সম্পর্কেও জানতে পারেন না এবং ঈমানের বিশদ বিবরণ সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল হতে পারেন না। কিতাব সম্পর্কে না জানার বিষয়টি বর্ণনা-সাপেক্ষ নয়। ঈমান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হওয়ার অর্থ এই যে, ঈমানের বিবরণ, ঈমানের শর্তাবলী এবং ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর সম্পর্কে ওহীর পূর্বে জ্ঞান থাকে না। নতুবা এ বিষয়ে আলিমগণের ইজমা তথা ঐকমত্য রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে রসূল ও নবী করেন, তাকে শুরু থেকেই ঈমানের উপর পয়দা করেন। তাঁর মন-মানসিকতা ঈমানের উপর ভিত্তিশীল থাকে। নবুয়ত দান ও ওহী অবতরণের পূর্বেও তিনি পাকাপোক্ত মু'মিন হয়ে থাকেন। ঈমান তাঁর মজ্জা ও চারত্রে পরিণত হয়। এ কারণেই যুগে যুগে বিভিন্ন সম্প্রদায় পয়গম্বরগণের বিরোধিতা করে তাদের প্রতি নানা রকম দোষারোপ করেছে, কিন্তু কোন পয়গম্বরকে বিরোধীরা এই দোষ দেয়নি যে, আপনিও তো নবুয়ত দাবির পূর্বে আমাদের মতই প্রতিমা পূজা করতেন। কুরতুবী তাঁর তফসীরে এবং কাযী আয়ায 'শেফা' গ্রন্থে এ বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন।

سورة الزخرف

সূরা যুখরুফ

মক্কায় অবতীর্ণ, ৮৯ আয়াত, ৭ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

حٰمٓ ۝١ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝٢ اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ
تَعْقِلُوْنَ ۝٣ وَاِنَّهٗ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ ۝٤ اَفَنَضْرِبُ
عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ۝٥ وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ
نَّبِيٍّ فِي الْاَوَّلِيْنَ ۝٦ وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝٧
فَاَهْلَكْنَآ اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَّمَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ ۝٨

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) হা-মীম (২) শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের (৩) আমি একে করেছি কোরআন, আরবী ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝ। (৪) নিশ্চয় এ কোরআন আমার কাছে সমুন্নত, অটল রয়েছে লওহে-মাহফুযে। (৫) তোমরা সীমাতিক্রমকারী সম্প্রদায়——এ কারণে কি আমি তোমাদের কাছ থেকে কোরআন প্রত্যাহার করে নেব? (৬) পূর্ববর্তী লোকদের কাছে আমি অনেক রসূলই প্রেরণ করেছি। (৭) যখনই তাদের কাছে কোন রসূল আগমন করেছেন, তখনই তারা তাঁর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। (৮) সুতরাং আমি তাদের চেয়ে অধিক শক্তিসম্পন্নদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। পূর্ববর্তীদের এ ঘটনা অতীত হয়ে গেছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হা-মীম (এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন।) কসম সুস্পষ্ট কিতাবের যে, আমি একে আরবী ভাষায় কোরআন করেছি, যাতে (হে আরব) তোমরা (সহজে)

বুঝ। এটা আমার কাছে লওহে-মাহ্ফুযে, সমুন্নত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কিতাব। সুতরাং এমন কিতাবকে অবশ্যই মেনে নেয়া উচিত। (তোমরা না মানলেও আমি আমার প্রজ্ঞার তাগিদে একে প্রেরণ ও এর মাধ্যমে তোমাদেরকে সম্বোধন পরিত্যাগ করব না। সেমতে ইরশাদ হয়েছে---) তোমরা (আনুগত্যের) সীমাতিক্রমকারী সম্প্রদায়---(শুধু) এ কারণেই কি আমি তোমাদের কাছ থেকে এ কোরআন প্রত্যাহার করে নেব (অর্থাৎ তোমাদের মানা, না-মানা উভয় অবস্থায় উপদেশ দান করা হবে, যাতে মু'মিনগণ উপকৃত হয় এবং তোমরা জব্দ হও)। আমি পূর্ববর্তীদের মধ্যে (তাদের মিথ্যারোপ সত্ত্বেও) অনেক নবী প্রেরণ করেছি। (তাদের মিথ্যারোপের কারণে নবুয়তের ধারা বন্ধ করে দেয়া হয়নি। হে পয়গম্বর! আমি যেমন তাদের মিথ্যারোপের পরওয়া করিনি, তেমনি আপনিও পরওয়া ও দুঃখ করবেন না। কেননা, আগেকার লোকদের অবস্থা এমন ছিল যে) যখনই তাদের কাছে কোন রসূল আগমন করেছে, তখনই তারা তাঁর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। অতপর আমি তাদের (অর্থাৎ মক্কাবাসীদের) চেয়ে অধিক শক্তিসম্পন্নদেরকে (মিথ্যারোপ ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের শাস্তিস্বরূপ) ধ্বংস করে দিয়েছি। পূর্ববর্তীদের এ ঘটনা অতীত হয়ে গেছে। (সুতরাং আপনি দুঃখ করবেন না। তাদেরও এরূপ অবস্থা হবে, যেমন বদর ইত্যাদি যুদ্ধে হয়েছে এবং তাদেরও নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়। কারণ, শাস্তির নমুনা বিদ্যমান রয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। তবে হযরত মুকাতিল (র) বলেন, وَاسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ। কেউ কেউ বলেন, সূরাটি মি'রাজের সময় আকাশে অবতীর্ণ হয়েছে।---(রূহুল মা'আনী)

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ----এতে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা যে বস্তুর কসম করেন, তা সাধারণত পরবর্তী দাবির দলীল হয়ে থাকে। এখানে কোরআনের কসম করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোরআন স্বয়ং তার অলৌকিকতার কারণে নিজের সত্যতার দলীল। কোরআনকে সুস্পষ্ট বলার অর্থ এই যে, এর উপদেশ পূর্ণ বিষয়বস্তু সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু এ থেকে শরীয়তের বিধি-বিধান চয়ন করা নিঃসন্দেহে এক দুরূহ কাজ। ইজতিহাদের পূর্ণ যোগ্যতা ব্যতিরেকে এ কাজ করা যায় না। সেমতে অন্যত্র একথা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ---(নিঃসন্দেহে আমি কোরআনকে উপদেশ হাসিলের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী

আছে কি?) এতে বলা হয়েছে যে, কোরআন উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ। এ থেকে ইজতিহাদ ও বিধান চয়ন সহজ হওয়া জরুরী হয় না, বরং অন্যভাবে প্রমাণিত রয়েছে যে, এ কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করা শর্ত।

প্রচারকের পক্ষে নিরাশ হয়ে বসে থাকা উচিত নয়ঃ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ----(আমি কি তোমাদের কাছ থেকে এ উপদেশগ্রন্থ প্রত্যাহার করে নেব এ কারণে যে, তোমরা সীমাতিক্রমকারী সম্প্রদায়?) উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা অবাধ্যতায় যতই সীমা অতিক্রম কর না কেন, আমি তোমাদেরকে কোরআনের মাধ্যমে উপদেশ দান পরিত্যাগ করব না। এ থেকে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি দাওয়াত ও তবলীগের কাজ করে, তার উচিত প্রত্যেকের কাছে পয়গাম নিয়ে যাওয়া এবং কোন দলের কাছে তবলীগ শুধু এ কারণে পরিত্যাগ করা উচিত নয় যে, তারা চরম পর্যায়ের মুলহিদ, বে-দ্বীন অথবা পাপাচারী।

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ
الْعَلِيمُ ۝٩ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَّجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا
لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝١٠ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا
بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذٰلِكَ تُخْرَجُونَ ۝١١ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا
وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ۝١٢ لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُورِهٖ
ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحٰنَ
الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِينَ ۝١٣ وَإِنَّآ إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ۝١٤
وَجَعَلُوا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ۝١٥ أَمِ
اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنٰتٍ وَّأَصْفٰكُمْ بِالْبَنِينَ ۝١٦ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا
ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيمٌ ۝١٧ أَوَمَنْ

يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿١٨﴾ وَجَعَلُوا
الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ إِنَاثًا ۚ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ
شَهَادَتُهُمْ وَيُسْـَٔلُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا لَوْ شَآءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ ۚ مَا لَهُمْ
بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ ءَاتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا مِّنْ قَبْلِهِۦ
فَهُمْ بِهِۦ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٢١﴾ بَلْ قَالُوٓا إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلٰٓى أُمَّةٍ وَإِنَّا
عَلٰٓى ءَاثٰرِهِم مُّهْتَدُونَ ﴿٢٢﴾ وَكَذٰلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ
مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ ۙ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلٰٓى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلٰٓى
ءَاثٰرِهِم مُّقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾ قٰلَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ
ءَابَآءَكُمْ ۖ قَالُوٓا إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كٰفِرُونَ ﴿٢٤﴾ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۖ فَٱنظُرْ
كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٥﴾

(৯) আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্, (১০) যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং তাতে তোমাদের জন্য করেছেন পথ, যাতে তোমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পার। (১১) এবং যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন পরিমিত। অতপর তদ্দ্বারা আমি মৃত ভূ-ভাগকে পুনরুজ্জীবিত করেছি। তোমরা এমনিভাবে উত্থিত হবে। (১২) এবং যিনি সব কিছুর যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং নৌকা ও চতুষ্পদ জন্তুকে তোমাদের জন্য যানবাহনে পরিণত করেছেন, (১৩) যাতে তোমরা তাদের পিঠের উপর আরোহণ কর। অতপর তোমাদের পালনকর্তার নিয়ামত স্মরণ কর এবং বল পবিত্র তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন এবং আমরা এদেরকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। (১৪) আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাব। (১৫) তারা আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্য থেকে আল্লাহ্র অংশ স্থির করেছে। বাস্তবিক মানুষ স্পষ্ট অকৃতজ্ঞ। (১৬) তিনি কি তাঁর সৃষ্টি থেকে কন্যা সন্তান গ্রহণ করেছেন এবং তোমাদের জন্য মনোনীত

করেছেন পুত্র সন্তান? (১৭) তারা রহমান আল্লাহ্‌র জন্য যে কন্যা সন্তান বর্ণনা করে, যখন তাদের কাউকে তার সংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং ভীষণ মনস্তাপ ভোগ করে। (১৮) তারা কি এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র জন্য বর্ণনা করে, যে অলংকারে লালিত-পালিত হয় এবং বিতর্কে কথা বলতে অক্ষম? (১৯) তারা নারী স্থির করে ফিরিশতাগণকে, যা আল্লাহ্‌র বান্দা। তারা কি তাদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছে। এখন তাদের দাবি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে। (২০) তারা বলে, রহমান আল্লাহ্‌ ইচ্ছা না করলে আমরা ওদের পূজা করতাম না। এ বিষয়ে তারা কিছুই জানে না। তারা কেবল অনুমানে কথা বলে। (২১) আমি কি তাদেরকে কোরআনের পূর্বে কোন কিতাব দিয়েছি, অতপর তারা তাকে আঁকড়ে রেখেছে? (২২) বরং তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক পথের পথিক এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে পথপ্রাপ্ত। (২৩) এমনিভাবে আপনার পূর্বে আমি যখন কোন জনপদে কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখনই তাদের বিত্তশালীরা বলেছে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক পথের পথিক এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে চলছি। (২৪) সে বলত, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে বিষয়ের উপর পেয়েছ, আমি যদি তদপেক্ষা উত্তম বিষয় নিয়ে তোমাদের কাছে এসে থাকি, তবুও কি তোমরা তাই বলবে? তারা বলত তোমরা যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছ, তা আমরা মানব না। (২৫) অতপর আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। অতএব দেখুন, মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌, (বলা বাহুল্য, যে সত্তা একা এসব মহাসৃষ্টির স্রষ্টা, ইবাদতও একমাত্র তাঁরই করা উচিত। সুতরাং তাদের স্বীকারোক্তি দ্বারাই তওহীদ প্রমাণিত হয়ে যায়। অতপর তওহীদকে আরও সপ্রমাণ করার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর আরও কিছু কাজ উল্লেখ করেন। অর্থাৎ তিনিই সে আল্লাহ্‌) যিনি আকাশ ও পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা (সদৃশ) করেছেন। (তোমরা তার উপর আরাম কর) এবং তাতে (পৃথিবীতে) তোমাদের (মনযিলে-মকছুদে পৌঁছার) জন্য পথ করেছেন, যাতে (সেসব পথে চলে) তোমরা মনযিলে মকছুদে পৌঁছতে পার এবং যিনি আকাশ থেকে পরিমিতভাবে (তাঁর ইচ্ছা ও প্রজ্ঞা মুতাবিক) পানি বর্ষণ করেছেন, অতপর আমি তদ্দ্বারা (সে পানি দ্বারা) শুষ্ক ভূমিকে (তার উপযুক্ত) জীবন দান করেছি। (এ থেকে তওহীদ ব্যতীত একথাও বোঝা উচিত যে,) তোমরা এমনিভাবে (কবর থেকে) উত্থিত হবে এবং যিনি বিভিন্ন বস্তুর) বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য নৌকা ও চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যেগুলোর উপর তোমরা সওয়ার হও, যাতে তোমরা নৌকা (-এর

উপরে) ও চতুষ্পদ জন্তুর পিঠের উপর (স্থিরভাবে) চড়ে বসতে পার। অতপর যখন তোমরা এগুলোর উপর বসবে, তখন তোমাদের পালনকর্তার (এই) নিয়ামত (মনে মনে) স্মরণ কর এবং (মুখে মোস্তাহাব বিধানরূপে) বল, পবিত্র তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। বস্তুত আমরা এমন (শক্তিশালী ও কৌশলী) ছিলাম না যে, এদেরকে বশীভূত করতে পারতাম। কেননা, আমরা জন্তুদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী নই এবং আল্লাহ্‌র জাগ্রত করা বুদ্ধি ব্যতীত নৌকা চালনার কৌশল জানতাম না। উভয় কৌশল আল্লাহ্ তা'আলাই শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাব। (তাই আমরা এগুলোতে সওয়ার হয়ে তাঁর কৃতজ্ঞতা ভুলি না এবং অহংকার করি না। তওহীদের প্রমাণাদি সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও) তারা (শিরক অবলম্বন করেছে, তাও এমন বিশ্রী শিরক যে, ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্‌র কন্যা সন্তান বলে এবং তাদের ইবাদত করে। সুতরাং এর এক অনিষ্ট তো এই যে, তারা) আল্লাহ্ কর্তৃক (সৃষ্ট) বান্দাদের থেকে আল্লাহ্‌র অংশ স্থির করেছে (অথবা আল্লাহ্‌র কোন অংশ হওয়া যুক্তিগতভাবে অসম্ভব)। বাস্তবিকই (এ ধরনের) মানুষ স্পষ্ট অকৃতজ্ঞ। (দ্বিতীয় অনিষ্ট এই যে, তারা কন্যা সন্তানকে হীন মনে করার পরেও আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা সন্তান স্থির করে তবে) তিনি কি তাঁর সৃষ্টি থেকে (তোমাদের ধারণা অনুযায়ী নিজের জন্য) কন্যা সন্তান পছন্দ করেছেন এবং তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান নির্ধারিত করেছেন? অথচ (তোমরা কন্যা সন্তানকে এত খারাপ মনে কর যে,) যখন তোমাদের কাউকে সে কন্যা সন্তানের সংবাদ দেয়া হয়, যাকে সে আল্লাহ্‌র জন্য বর্ণনা করে, তখন (অসন্তুষ্টির কারণে) তার মুখমণ্ডল কাল হয়ে যায় এবং সে ভীষণ মনস্তাপ ভোগ করে। (এ পর্যন্ত তাদের মিথ্যা বিশ্বাসের খণ্ডন বর্ণিত হয়েছে। এর ব্যাখ্যা সূরা সাফফাতে দেওয়া হয়েছে। অতপর তাদের বিশ্বাসের যুক্তিভিত্তিক খণ্ডন করা হচ্ছে। অর্থাৎ কন্যা সন্তান হওয়া যদিও কোন অপমান ও লজ্জার বিষয় নয়; কিন্তু এতে সন্দেহ নেই যে, কন্যা সৃষ্টিগতভাবে স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ও দুর্বলমনা হয়ে থাকে সুতরাং) তারা কি এমন কন্যা সন্তানকে আল্লাহ্‌র জন্য বর্ণনা করে, যে (স্বভাবত) অলংকারে (ও সাজসজ্জায়) লালিত-পালিত হয় (এর অপরিহার্য ফলশ্রুতি বুদ্ধি-বিবেকের অপরিপক্কতা) এবং সে (চিন্তাশক্তির দুর্বলতার কারণে) বিতর্কে কথা বলতেও অক্ষম? (সেমতে মহিলারা সাধারণত তাদের মনের ভাব জোরেশোরে ব্যক্ত করতে পুরুষদের তুলনায় কম সামর্থ্য রাখে; প্রায়ই অসম্পূর্ণ কথা বলে এবং তাতে অপ্রাসঙ্গিক কথা মিশ্রিত করে দেয়। তৃতীয় অনিষ্ট এই যে,) তারা (কাফিররা) ফেরেশতাগণকে যারা আল্লাহ্‌র (সৃষ্ট) বান্দা (তাই আল্লাহ্ তাদের পূর্ণ অবস্থা জানেন। তারা দৃষ্টিগোচর হয় না, তাই তাদের কোন অবস্থা আল্লাহ্ তা'আলার বর্ণনা ব্যতীত কেউ জানতে পারে না। আল্লাহ্ কোথাও বর্ণনা করেন নি যে, ফেরেশতাগণ নারী। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা তাদেরকে বিনা দলীলে) নারী স্থির করেছে। (এর পক্ষে কোন যুক্তিও নেই, কোন ইতিহাসগত প্রমাণও নেই।) তারা কি তাদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছে? (জওয়াব

সুস্পষ্ট যে, তারা প্রত্যক্ষ করেনি। কাজেই তাদের নির্বোধসুলভ দাবি অসার।) তাদের এই (যুক্তিহীন) দাবি (আমলনামায়) লিপিবদ্ধ করা হবে এবং (কিয়ামতে) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। (অতপর ফেরেশতাগণের উপাস্য হওয়া সম্পর্কে বলা হচ্ছে ঃ) তারা বলে, যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন (যে, ফেরেশতাগণের ইবাদত না হোক; অর্থাৎ, যদি এই ইবাদতে তিনি অসন্তুষ্ট হতেন,) তবে আমরা (কখনও) তাদের ইবাদত করতাম না। (কেননা, তিনি তা করতেই দিতেন না। বলপূর্বক বন্ধ করে দিতেন। অতএব জানা গেল যে, তিনি তাদের ইবাদত না করলে সন্তুষ্ট নন, বরং ইবাদত করলে সন্তুষ্ট হন। অতপর খণ্ডনে বলা হয়েছে,) তারা এ বিষয়ে কিছুই জানে না। তারা কেবল অনুমানে কথা বলে। (কেননা, আল্লাহ্ কোন বান্দাকে কোন কাজের শক্তি দিলে প্রমাণিত হয় না যে, তিনি এ কাজে সন্তুষ্টও আছেন। অষ্টম পারার প্রথমার্ধে— سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا —আয়াতে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হয়ে গেছে। এখন তারা বলুক,) আমি কি তাদেরকে কোরআনের পূর্বে কোন কিতাব দিয়েছি যে, তারা (এ দাবিতে) সেটিকে দলীল করছে? (প্রকৃতপক্ষে তাদের কাছে কোন দলীল নেই।) বরং (কেবল পূর্বপুরুষদের অনুসরণ আছে। সেমতে) তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এ মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি। আমরাও তাদের পদাংক অনুসরণ করে চলছি। (তারা যেমন বিনা দলীলে বরং দলীলের বিপরীতে প্রাচীন প্রথা-পদ্ধতিকে দলীল হিসেবে পেশ করে,) এমনিভাবে আপনার পূর্বে আমি যখনই কোন জনপদে কোন সতর্ককারী পয়গম্বর প্রেরণ করেছি, তখনই তাদের বিত্তশালীরা (প্রথমে ও অনুসারীরা পরে) বলেছে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এক মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি। আমরাও তাদের পদাংক অনুসরণ করে চলছি। (এতে) সে (অর্থাৎ পয়গম্বর) বলতেন, (তোমরা কি পৈতৃক প্রথা-পদ্ধতিরই অনুসরণ করে যাবে,) যদিও আমি তোমাদের পূর্বপুরুষদের বিষয় অপেক্ষা উত্তম বিষয় নিয়ে তোমাদের কাছে এসে থাকি? তারা (হঠকারিতার ছলে) বলত, তোমরা (তোমাদের ধারণা মতে) যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছ, আমরা তা মানিই না। অতপর (হঠকারিতা সীমা ছাড়িয়ে গেলে) আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। অতএব দেখুন, মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কেমন (মন্দ) হয়েছে!

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا —(তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা করেছেন।) উদ্দেশ্য এই যে, পৃথিবীর বাহ্যিক আকার বিছানার মতো এবং এতে বিছানার অনুরূপ আরাম পাওয়া যায়। সুতরাং এটা গোলাকার হওয়ার পরিপন্থী নয়।

وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ —(তোমাদের জন্য নৌকা

ও চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা আরোহণ কর।) মানুষের যানবাহন দু'প্রকার। এক. যা মানুষ নিজের শিল্পকৌশল দ্বারা নিজেই তৈরী করে। দুই. যার সৃষ্টিতে মানুষের শিল্পকৌশলের কোন দখল নেই। 'নৌকা' বলে প্রথম প্রকার যানবাহন এবং চতুষ্পদ জন্তু বলে দ্বিতীয় প্রকার যানবাহন বোঝানো হয়েছে। সর্বাবস্থায় উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের ব্যবহারের যাবতীয় যানবাহন আল্লাহ্ তা'আলার মহা অবদান। চতুষ্পদ জন্তু যে অবদান, তা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। এগুলো মানুষের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি শক্তিশালী হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এগুলোকে মানুষের এমন বশীভূত করে দিয়েছেন যে, একজন বালকও ওদের মুখে লাগাম অথবা নাকে রশি লাগিয়ে যথা ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারে। এমনিভাবে যেসব যানবাহন তৈরিতে মানুষের শিল্পকৌশলের দখল আছে, সেগুলোও আল্লাহ্ তা'আলারই অবদান। উড়োজাহাজ থেকে শুরু করে মামুলি সাইকেল পর্যন্ত যদিও বাহ্যত মানুষ নির্মাণ করে, কিন্তু এগুলো নির্মাণের কৌশল আল্লাহ্ ব্যতীত কে শিক্ষা দিয়েছে? সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলাই মানুষের মস্তিষ্কে এমন শক্তি দান করেছেন যে, লোহাকেও মোমে পরিণত করে ছাড়ে। এছাড়া এগুলোর নির্মাণে যে কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়, তা এবং তার বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সরাসরি আল্লাহ্র সৃষ্টি।

ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ ---(এবং যাতে তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অবদান স্মরণ কর।) এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একজন বুদ্ধিমান ও সচেতন মানুষের কর্তব্য হল সত্যিকার দাতা আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতসমূহ ব্যবহার করার সময় অমনোযোগিতা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করার পরিবর্তে এ বিষয়ের ধ্যান করা যে, এগুলো আমার প্রতি আল্লাহ্র দান। কাজেই তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও তাঁর উদ্দেশ্যে বিনয় ও অসহায়ত্ব ব্যক্ত করা আমার উপর ওয়াজিব। সৃষ্ট জগতের নিয়ামতসমূহ মু'মিন ও কাফির উভয়েই ব্যবহার করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মু'মিন ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য এই যে, কাফির চরম উদাসীনতা ও বেপরোয়া মনোভাব নিয়ে ব্যবহার করে আর মু'মিন আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহকে চিন্তায় উপস্থিত রেখে তাঁর সামনে বিনয়াবনত হয়। এ লক্ষ্যেই কোরআন ও হাদীসে বিভিন্ন কাজ আনজাম দেওয়ার সময় সবর ও শোকরের বিষয়বস্তু সম্বলিত বিভিন্ন দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। মানুষ যদি দৈনন্দিন জীবনে উঠাবসা ও চলাফেরায় এসব দোয়া নিয়মিত পাঠ করে, তবে তার প্রত্যেক বৈধ কাজই ইবাদত হয়ে যেতে পারে। এসব দোয়া আল্লামা জযরীর কিতাব 'হিসনে হাসীনে' এবং মওলানা আশরাফ আলী থানভীর কিতাব 'মোনাজাতে মকবুলে' দ্রষ্টব্য।

সফরের দোয়া ঃ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا ---(পবিত্র তিনি, যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন।) এটা যানবাহনে বসে পাঠ করার দোয়া। রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে একাধিক রেওয়ায়েতে প্রমাণিত আছে যে, তিনি সওয়ারীর জন্তুর

উপর বসার সময় এই দোয়া পাঠ করতেন। আরোহণ করার মোস্তাহাব পদ্ধতি হযরত আলী (রা) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে যে, সওয়ারীতে পা রাখার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলবে, অতপর সওয়ার হওয়ার পরে 'আলহামদুলিল্লাহ্' পাঠ করে سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ—থেকে শুরু করে لَمُنْقَلِبُوْنَ পর্যন্ত পাঠ করবে। --(কুরতুবী) আরও বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) সফরে রওয়ানা হয়ে উপরোক্ত দোয়ার পর নিম্নোক্ত দোয়াও পাঠ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَّعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَاٰبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ -

এক রেওয়ায়েতে এ বাক্যও বর্ণিত আছে ঃ

اَللّٰهُمَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ اِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

---(কুরতুবী)

وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ—(আমরা এমন ছিলাম না যে, একে বশীভূত করব। এটা যান্ত্রিক যানবাহনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা মৌল উপাদান সৃষ্টি না করলে অথবা তাতে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য ও প্রতিক্রিয়া না রাখলে অথবা মানুষের মস্তিষ্কে সেসব বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারের শক্তি দান না করলে সমগ্র সৃষ্টি একত্রিত হয়েও এমন যানবাহন সৃষ্টি করতে সক্ষম হত না।

وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ—(নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের পালনকর্তার দিকেই ফিরে যাব।) এ বাক্যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের উচিত পার্থিব সফরের সময় পরকালের কঠিন সফরের কথা স্মরণ করা, যা সর্বাবস্থায় সংঘটিত হবে। সে সফর সহজে অতিক্রম করার জন্য সৎকর্ম ব্যতীত কোন সওয়ারী কাজে আসবে না।

وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا—(তারা আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্য থেকে আল্লাহ্র অংশ স্থির করেছে।) এখানে অংশ বলে সন্তান বোঝানো হয়েছে। মুশরিকরা

ফেরেশতাগণকে 'আল্লাহ্‌র কন্যা সন্তান' আখ্যা দিত। 'সন্তান' না বলে 'অংশ' বলে মুশরিকদের এই বাতিল দাবির যুক্তিভিত্তিক খণ্ডনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সংক্ষেপে তা এভাবে যে, আল্লাহ্ তা'আলার কোন সন্তান থাকলে সে আল্লাহ্ তা'আলার অংশ হবে। কেননা, পুত্র পিতার অংশ হয়ে থাকে। যুক্তিসংগত নিয়ম এই যে, প্রত্যেক বস্তু স্বীয় অস্তিত্বের জন্য তার অংশসমূহের প্রতি মুখাপেক্ষী। এ থেকে জরুরী হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ্ তা'আলাও তাঁর সন্তানের প্রতি মুখাপেক্ষী হবেন। বলা বাহুল্য যে কোন প্রকার মুখাপেক্ষিতা আল্লাহ্‌র মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

أَوَمَن يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ—(যে অলংকার ও সাজসজ্জায় লালিত-পালিত হয়—) এ থেকে জানা গেল যে, নারীর জন্য অলংকার ব্যবহার এবং শরীয়তসম্মত সাজসজ্জা অবলম্বন করা জায়েয। এ বিষয়ে ইজমাও আছে। কিন্তু বর্ণনাপদ্ধতি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সারাদিনমান সাজসজ্জা ও প্রসাধনে ডুবে থাকা সমীচীন নয়। এটা বিবেক-বুদ্ধির দুর্বলতার লক্ষণ ও কারণ।

وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ—(এবং সে বিতর্কে কথা বলতেও অক্ষম।) উদ্দেশ্য এই যে, অধিকাংশ নারী মনের ভাব জোরেশোরে ও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে পুরুষদের সমান সক্ষম নয়। এ কারণেই বিতর্কে নিজেদের দাবি সপ্রমাণ করা ও প্রতিপক্ষের দাবি প্রমাণ সহকারে খণ্ডন করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু এটা অধিকাংশের দিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। কাজেই কোন কোন নারী যদি বাকপটুতায় পুরুষদেরকেও হারিয়ে দেয়, তবে সেটা এ আয়াতের পরিপন্থী হবে না। কেননা, অধিকাংশের লক্ষ্যেই সাধারণত নীতি বর্ণনা করা হয়। নারীদের অধিকাংশ এরূপই বটে।

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا الَّذِي
فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ بَلْ مَتَّعْتُ هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ
مُّبِينٌ ﴿٢٩﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٠﴾

(২৬) যখন ইবরাহীম তাঁর পিতা ও সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা যাদের পূজা কর, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। (২৭) তবে আমার সম্পর্ক তাঁর সাথে

যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব তিনিই আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করবেন। (২৮) এ কথাটিকে সে অক্ষয় বাণীরূপে তার সন্তানদের মধ্যে রেখে গেছে, যাতে তারা আল্লাহ্‌র আরুষ্ট থাকে। (২৯) পরন্তু আমিই এদেরকে ও এদের পূর্বপরুষদেরকে জীবনোপভোগ করতে দিয়েছি, অবশেষে তাদের কাছে সত্য ও স্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল আগমন করেছে। (৩০) যখন সত্য তাদের কাছে আগমন করল, তখন তারা বলল, এটা জাদু, আমরা একে মানি না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(সে সময়টিও স্মরণযোগ্য) যখন ইবরাহীম (আ) তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা যাদের পূজা-অর্চনা কর, আমি তাদের (পূজার) সাথে কোন সম্পর্ক রাখি না। (সে আল্লাহ্‌র সাথে আমি সম্পর্ক রাখি) যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতপর তিনিই আমাকে (আমার ইহকাল ও পরকালীন স্বার্থের) পথে পরিচালিত করবেন। [উদ্দেশ্য এই যে, কাফিরদের উচিত ইবরাহীম (আ)-এর অবস্থা স্মরণ করা। তিনি নিজেও তওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ওসিয়তের মাধ্যমে] এ বিশ্বাসকে তিনি সন্তানদের মধ্যে চিরন্তন বাণীরূপে রেখে গেছেন, [অর্থাৎ সন্তানদেরকেও এ বিষয়ে ওসিয়ত করেছেন, যার কিছু কিছু প্রতিক্রিয়া রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ফলে জাহিলিয়াত যুগেও আরবে কিছু সংখ্যক লোক শিরককে ঘৃণা করত। এ ওসিয়ত তিনি এজন্য করেন,] যাতে (প্রতি যুগে) তারা (মুশরিকরা তওহীদ পন্থীদের কাছে তওহীদের বিশ্বাস শুনে শিরক থেকে) ফিরে আসে। (কিন্তু তারা তবুও ফিরে আসেনি এবং এ দিকে মনোযোগ দেয়নি।) পরন্তু আমি তাদেরকে ও তাদের পূর্বপুরুষদেরকে (পার্থিব) জীবনোপভোগ করতে দিয়েছি, (তারা এতে মগ্ন হয়ে আছে। অবশেষে (এই মগ্নতা ও উদাসীনতা থেকে জাগ্রত করার জন্য) তাদের কাছে সত্য কোরআন (যা অলৌকিকতার কারণে নিজেই নিজের সত্যতার দলীল) এবং স্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) আগমন করেছে। যখন তাদের কাছে সত্য কোরআন আগমন করল, (এবং তার অলৌকিকতা প্রকাশ পেল,) তখন তারা বলল, এটা জাদু। আমরা একে মানি না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ—পূর্ববর্তী আয়াতের শেষে বলা হয়েছিল, মুশরিকদের কাছে তাদের পূর্বপুরুষদের অনুকরণ ব্যতীত শিরকের কোন দলীল নেই। বলা বাহুল্য সুস্পষ্ট যুক্তিভিত্তিক ও ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও কেবল পূর্বপুরুষদের অনুকরণ করা খুবই অযৌক্তিক ও গর্হিত কাজ। এখন আলোচ্য আয়াতসমূহে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি পূর্বপুরুষদেরই অনুকরণ করতে চাও, তবে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অনুসরণ কর না কেন, যিনি তোমাদের সম্ভ্রান্ততম পূর্বপুরুষ এবং যাঁর সাথে সম্পর্ক

রাখাকে তোমরা গর্বের বিষয় মনে কর? তিনি কেবল তওহীদেই বিশ্বাসী ছিলেন না, বরং তাঁর কর্মপন্থা পরিষ্কার ব্যক্ত করে যে, যুক্তিভিত্তিক ও ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণাদির উপস্থিতিতে কেবল পূর্বপুরুষদের অনুকরণ করা বৈধ নয়। তিনি যখন দুনিয়াতে প্রেরিত হন, তখন তাঁর গোটা সম্প্রদায় তাদের পূর্বপুরুষদের অনুকরণে শিরকে লিপ্ত ছিল। কিন্তু তিনি পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণের পরিবর্তে সুস্পষ্ট প্রমাণাদির অনুসরণ করে সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করে বলেন, إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ —তোমরা যাদের পূজা কর, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, কোন ব্যক্তি যদি কুকর্মী ও অবিশ্বাসী দলের মধ্যে বসবাস করে এবং তাদের ধ্যান-ধারণার ব্যাপারে নীরব থাকে, তাকেও তাদের সমমনা মনে করার আশংকা থাকে, তাহলে কেবল তার বিশ্বাস ও কর্ম ঠিক করে নেয়াই যথেষ্ট হবে না, বরং সেই দলের বিশ্বাস ও কর্মের সাথে তার সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করাও জরুরী হবে। সেমতে হযরত ইবরাহীম (আ) কেবল নিজের বিশ্বাস ও কর্মকে মুশরিকদের থেকে স্বতন্ত্র করেই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং মুখে ও সর্বসমক্ষে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করেছেন।

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ —(তিনি একে তাঁর সন্তানদের মধ্যে একটি চিরন্তন বাণীরূপে রেখে গেছেন।) উদ্দেশ্য এই যে, তিনি তাঁর তওহীদি বিশ্বাসকে নিজের সত্তা পর্যন্তই সীমিত রাখেন নি, বরং তাঁর বংশধরকেও এ বিশ্বাসে অটল থাকার ওসিয়ত করেছেন। সেমতে তাঁর বংশধরদের মধ্যে বিরাট সংখ্যক লোক তওহীদপন্থী ছিল। স্বয়ং মক্কা মোকাররমা ও তার আশেপাশে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাব পর্যন্ত অনেক সুস্থমনা ব্যক্তি বিদ্যমান ছিল, যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হওয়ার পরেও ইবরাহীম (আ)-এর মূল ধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, নিজেকে ছাড়াও সন্তানসন্ততিকে বিশুদ্ধ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করার চিন্তা করাও মানুষের অন্যতম কর্তব্য। পয়গম্বরগণের মধ্যে হযরত ইয়াকুব (আ) সম্পর্কেও কোরআন বর্ণনা করেছে যে, তিনি ওফাতের সময় পুত্রদেরকে বিশুদ্ধ ধর্মে কায়েম থাকার ওসিয়ত করেছিলেন। সুতরাং যে কোন সম্ভাব্য উপায়ে সন্তানসন্ততির কর্ম ও চরিত্র সংশোধনে পূর্ণ প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা যেমন জরুরী, তেমনি পয়গম্বরগণের সুন্নতও বটে। সন্তানদের সংশোধনের অনেক পদ্ধতি রয়েছে যা স্থান বিশেষে অবলম্বন করা যায়। কিন্তু শায়েখ আবদুল ওয়াহ্হাব শা'রানী (র) 'লাতায়েফুল মিনান' গ্রন্থে একটি কার্যকরী পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, পিতা-মাতা সন্তানদের সংশোধনের জন্য সযত্নে দোয়া করবেন। পরিতাপের বিষয়, এই সহজ

পদ্ধতির প্রতি আজকাল ব্যাপক উদাসীনতা প্রদর্শন করা হচ্ছে। অবশ্য স্বয়ং পিতা-মাতাই এর অশুভ পরিণতি প্রত্যক্ষ করে থাকেন।

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ﴿٣١﴾
اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿٣٢﴾

(৩১) তারা বলে, কোরআন কেন দুই জনপদের কোন প্রধান ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হল না? (৩২) তারা কি আপনার পালনকর্তার রহমত বন্টন করে? আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি পার্থিব জীবনে এবং একের মর্যাদাকে অপরের উপর উন্নীত করেছি, যাতে একে অপরকে সেবকরূপে গ্রহণ করে। তারা যা সঞ্চয় করে, আপনার পালনকর্তার রহমত তদপেক্ষা উত্তম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[কাফিররা কোরআন সম্পর্কে একথা বলেছে, আর রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে] তারা বলে, এ কোরআন (আল্লাহ্র কালাম হলে এবং রসূলের মাধ্যমে এসে থাকলে এটি) দুই জনপদের (অর্থাৎ মক্কা ও তায়েফের) কোন প্রধান ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হল না কেন? [অর্থাৎ রসূলের জন্য প্রধান ও প্রতিপত্তিশালী হওয়া জরুরী। রসূলে করীম (সা) ধনাঢ্যও নন, সমাজপতিও নন। কাজেই তিনি রসূল হতে পারেন না। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কথা খণ্ডন প্রসঙ্গে বলেন,] তারা কি আপনার পালনকর্তার বিশেষ রহমত (অর্থাৎ নবুয়ত) বন্টন করতে চায়? (অর্থাৎ তারা কি বলতে চায় যে, নবুয়ত তাদের মত অনুযায়ী প্রাপ্ত হওয়া উচিত? তারা যেন নবুয়ত বন্টনের দায়িত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা করে; অথচ এটা নিরেট মূর্খতা। কেননা, (পার্থিব জীবনে তাদের জীবিকা আমিই বন্টন করেছি এবং (এ বন্টনে) একের মর্যাদা অপরের উপর উন্নত করেছি, যাতে (এই উপযোগিতা অর্জিত হয় যে,) একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নেয় (ফলে জগতের ব্যবস্থাপনা ঠিক থাকে। এটা স্পষ্ট ও নিশ্চিত যে,) আপনার পালনকর্তার (বিশেষ) রহমত (অর্থাৎ নবুয়ত) বহুগুণে সে বস্তু (অর্থাৎ পার্থিব ধনসম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও পদমর্যাদা) অপেক্ষা উত্তম, যা তারা সঞ্চয় করে ফিরে। (সুতরাং পার্থিব জীবিকা যখন আমিই বন্টন করেছি; তাদের মতের উপর ছেড়ে দেইনি; অথচ এটা হীন পর্যায়ের বিষয়, তখন নবুয়ত, যা নিজেও উচ্চ পর্যায়ের

বিষয় এবং তার উপযোগিতাসমূহও উৎকৃষ্ট স্তরের, তা কিরূপে তাদের মতানুযায়ী বন্টন করা হবে?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের একটি আপত্তির জওয়াব দিয়েছেন। তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রিসালতের ব্যাপারে এ আপত্তি করত। প্রকৃতপক্ষে তারা শুরুতে এ কথা বিশ্বাস করতেই সম্মত ছিল না যে, রসূল কোন মানুষ হতে পারে। কোরআন পাক তাদের এ মনোভাব কয়েক জায়গায় উল্লেখ করেছে যে, আমরা মুহাম্মদ (সা)-কে কিরূপে রসূল মানতে পারি, যখন সে সাধারণ মানুষের মতই পানাহার করে এবং বাজারে চলাফেরা করে? কিন্তু যখন কোরআনের একাধিক আয়াতে ব্যক্ত করা হল যে, কেবল মুহাম্মদ (সা)-ই নন, দুনিয়াতে এ যাবত যত পয়গম্বর আগমন করেছেন, তারা সবাই মানুষ ছিলেন। তখন তারা পাঁয়তারা পরিবর্তন করে বলতে শুরু করল যে, যদি কোন মানুষকেই নবুয়ত সমর্পণ করার ইচ্ছা ছিল, তবে মক্কা ও তায়েফের কোন বিত্তবান ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিকে সমর্পণ করা হল না কেন? মুহাম্মদ (সা) তো কোন প্রভাবশালী, ধনী ব্যক্তি নন। কাজেই তিনি নবুয়ত লাভের যোগ্য নন। রেওয়ায়েতে আছে যে, এ ব্যাপারে তারা মক্কার ওলীদ ইবনে মুগীরা ও ওতবা ইবনে রবীয়া এবং তায়েফের ওরওয়া ইবনে মসউদ সকফী, হাবীব ইবনে আমর সকফী অথবা কেনানা ইবনে আবদে ইয়া'লীলের নাম পেশ করেছিল।---(রূহুল মা'আনী)

মুশরিকদের এ আপত্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা দু'টি উত্তর দিয়েছেন। প্রথম জওয়াব উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ের দ্বিতীয় আয়াতে এবং দ্বিতীয় জওয়াব এর পরবর্তী আয়াতে দেওয়া হয়েছে। যথাস্থানেই এর ব্যাখ্যাও করা হবে। প্রথম জওয়াবের সারমর্ম এই যে, এ ব্যাপারে তোমাদের নাক গলানোর কোন অধিকার নেই যে, আল্লাহ্ কাকে নবুয়ত দিচ্ছেন এবং কাকে দিচ্ছেন না। নবুয়তের বন্টন তোমাদের হাতে নয় যে, কাউকে নবী করার পূর্বে তোমাদের মত নিতে হবে। এটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র হাতে। তিনিই মহান। উপযোগিতা অনুযায়ী এ কাজ সমাধা করেন। তোমাদের অস্তিত্ব, জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা নবুয়ত বন্টনের দায়িত্ব লাভের যোগ্যই নয়। নবুয়ত বন্টন তো অনেক উচ্চস্তরের কাজ, তোমাদের মর্যাদা, অস্তিত্বও স্বয়ং তোমাদের জীবিকা ও জীবিকার আসবাবপত্র বন্টনের দায়িত্ব পালনেরও উপযুক্ত নয়। কারণ, আমি জানি তোমাদেরকে এ দায়িত্ব দেওয়া হলে তোমরা একদিনও জগতের কাজকারবার পরিচালনা করতে সক্ষম হবে না এবং গোটা ব্যবস্থাপনা ভণ্ডুল হয়ে যাবে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা পার্থিব জীবনে তোমাদের জীবিকা বন্টনের দায়িত্বও তোমাদের হাতে সোপর্দ করেন নি, বরং এ কাজ নিজের হাতেই রেখেছেন। অতএব যখন নিম্নস্তরের এ কাজ তোমাদেরকে সোপর্দ করা যায় না, তখন নবুয়ত বন্টনের মতো মহান কাজ কিরূপে তোমাদের হাতে সোপর্দ করা যাবে। আয়াতসমূহের উদ্দেশ্য তো এতটুকুই, কিন্তু মুশরিকদেরকে জওয়াব দান প্রসঙ্গে আল্লাহ্

তা'আলা বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যেসব ইঙ্গিত দিয়েছেন, সেগুলো থেকে কতিপয় অর্থনৈতিক মূলনীতি চয়ন করা যায়। এখানে এগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা জরুরী।

জীবিকা বন্টনের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা ঃ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ —আমি তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, আমি আমার অপার প্রজ্ঞার সাহায্যে বিশ্বের জীবন ব্যবস্থা এমন করেছি যে, এখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রয়োজনাদি মিটানোর ক্ষেত্রে অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী এবং সকল মানুষ এই পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার সূত্রে গ্রথিত হয়ে সমগ্র সমাজের প্রয়োজনাদি মিটিয়ে যাচ্ছে। আলোচ্য আয়াতটি খোলাখুলি ব্যক্ত করেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা জীবিকা বন্টনের কাজ (সোশ্যালিজমের ন্যায়) কোন ক্ষমতাশালী মানবিক প্রতিষ্ঠানের কাছে সোপর্দ করেননি, যে পরিকল্পনার মাধ্যমে স্থির করবে যে, সমাজের প্রয়োজনাদি কি কি, সেগুলো কিভাবে মেটানো হবে, উৎপাদিত সম্পদকে কি হারে কি কি কাজে লাগানো হবে এবং এগুলোর মধ্যে আয়ের বন্টন কিসের ভিত্তিতে করা হবে? এর পরিবর্তে এ সমস্ত কাজ আল্লাহ্ তা'আলা নিজের হাতে রেখেছেন। নিজের হাতে রাখার অর্থ এটাই যে, তিনি প্রত্যেককে অপরের মুখাপেক্ষী করে বিশ্ব-ব্যবস্থা এমনভাবে সাজিয়েছেন যে, এতে অস্বাভাবিক ইজারাদারী ইত্যাদির মাধ্যমে বাধা সৃষ্টি না করা হলে এ ব্যবস্থাটি আপনা-আপনি এসব সমস্যার সমাধান করে দেয়। পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার এই ব্যবস্থাকে বর্তমান অর্থনৈতিক পরিভাষায় 'আমদানী-রপ্তানীর' ব্যবস্থা বলা হয়। আমদানী-রপ্তানীর স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, যে বস্তুর আমদানী কম অথচ চাহিদা বেশি, তার মূল্য বৃদ্ধি পায়। কাজেই উৎপাদন যন্ত্রগুলো সেই বস্তু উৎপাদনে অধিক মুনাফা দেখে সেদিকেই ঝুঁকে পড়ে। অতপর যখন আমদানী রপ্তানীর তুলনায় বেড়ে যায়, তখন মূল্য হ্রাস পায়। ফলে সে বস্তুর অধিক উৎপাদন লাভজনক থাকে না এবং উৎপাদন যন্ত্রগুলো এর পরিবর্তে অন্য কাজে ব্যাপৃত হয়ে যায়, যার প্রয়োজন বেশি। ইসলাম আমদানী ও রপ্তানীর এসব শক্তির মাধ্যমেই সম্পদ উৎপাদন ও বন্টনের কাজ নিয়েছে এবং সাধারণ অবস্থায় জীবিকা বন্টনের কাজ কোন মানবিক প্রতিষ্ঠানের হাতে সোপর্দ করেনি। এর কারণ এই যে, পরিকল্পনা প্রণয়নের যত উন্নত পদ্ধতিই আবিষ্কৃত হোক না কেন, এর মাধ্যমে জীবিকার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি প্রয়োজন জানা সম্ভবপর নয়। এ ধরনের সামাজিক বিষয়াদি সাধারণত স্বাভাবিক ব্যবস্থার অধীনেই পরিচালিত হয়। জীবনের অধিকাংশ সামাজিক সমস্যা এমনি-ভাবে স্বাভাবিক পন্থায় আপনা-আপনি সমাধানপ্রাপ্ত হয়। এগুলোকে রাষ্ট্রের পরিকল্পনা প্রণয়নের সোপর্দ করা জীবনে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা ছাড়া কিছু নয়। উদাহরণত দিন কাজের জন্য এবং রাত্রি নিদ্রার জন্য। এ বিষয়টি কোন চুক্তি অথবা মানবিক পরিকল্পনা প্রণয়নের অধীনে স্থিরীকৃত হয়নি, বরং প্রকৃতির স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা আপনা-আপনি এ ফয়সালা করে দিয়েছে। এমনিভাবে কে কাকে বিয়ে করবে এ বিষয়টি স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত ব্যবস্থার অধীনে আপনা থেকেই সম্পন্ন হয় এবং একে পরিকল্পনা

প্রণয়নের মাধ্যমে সমাধান করার কল্পনা কারও মধ্যে জাগ্রত হয়নি। উদাহরণত কে জ্ঞান ও কারিগরির কোন বিভাগকে নিজের কার্যক্ষেত্র রূপে বেছে নিবে, এ বিষয়টি মানসিক আগ্রহ ও অনুরাগের পরিবর্তে সরকারের পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর সোপর্দ করা একটা অযথা জবরদস্তি মাত্র। এতে প্রাকৃতিক নিয়মে বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। এমনিভাবে জীবিকার ব্যবস্থাও আল্লাহ্ তা'আলা নিজের হাতে রেখে প্রত্যেকের মনে সেই কাজের প্রেরণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যা তার জন্যে অধিক উপযুক্ত এবং যা সে সুষ্ঠুভাবে আনজাম দিতে পারে। সেমতে প্রত্যেক ব্যক্তি এমনকি একজন ঝাড়ুদারও নিজের কাজ নিয়ে আনন্দিত ও গর্বিত থাকে— كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

---তবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ন্যায় ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে বৈধ ও অবৈধ উপায়ে সম্পদ একত্রিত করে অপরের জন্য রিযিকের দ্বার বন্ধ করে দেওয়ার স্বাধীনতা দেয়নি; বরং আমদানীর উপায়সমূহের মধ্যে হালাল ও হারামের পার্থক্য করে সুদ, ফটকাবাজি, জুয়া, মজুদদারি ইত্যাদিকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এরপর বৈধ আমদানীতেও যাকাত, ওশর ইত্যাদি কর আরোপ করে সেসব অনিষ্টের মূলোৎপাটন করেছে, যা বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পাওয়া যায়। এতদসত্ত্বেও কখনও ইজারাদারী প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ বৈধ রেখেছে।

সামাজিক সাম্যের তাৎপর্য ঃ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ —আমি

এককে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছি। এ থেকে জানা গেল যে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের আয় সম্পূর্ণভাবে সমান হোক----এ অর্থে সামাজিক সাম্য-কাম্যও নয় এবং সম্ভবপরও নয়। আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্ট জগতের প্রত্যেক মানুষের দায়িত্বে কিছু কর্তব্য আরোপ করেছেন এবং কিছু অধিকার দিয়েছেন আর এতদুভয়ের মধ্যে স্বীয় প্রজ্ঞার ভিত্তিতে এ গড় নির্বাচন করে দিয়েছেন যে, যার কর্তব্য যত বেশি, তার অধিকারও তত বেশি। মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সৃষ্ট জীবের দায়িত্বে কর্তব্য খুব কম আরোপ করা হয়েছে। তারা হালাল ও হারাম, জায়েয ও নাজায়েযের আওতাধীন নয়। তাই তাদের অধিকার সবচেয়ে কম। সেমতে তাদের ব্যাপারে মানুষকে প্রশস্ত স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। মানুষ নামে মাত্র কিছু বিধি-নিষেধ পালন করে যেভাবে ইচ্ছা, তাদের দ্বারা উপকৃত হতে পারে। সেমতে কোন কোন জীবকে মানুষ কেটে ভক্ষণ করে, কোন কোনটির পিঠে সওয়ার হয় এবং কোনটিকে পদতলে পিষ্ট করে, কিন্তু একে এসব জীবের অধিকার হরণ বলে গণ্য করা হয় না। কারণ তাদের কর্তব্য কম বিধায় তাদের অধিকারও কম। সৃষ্ট জগতের মধ্যে সর্বাধিক কর্তব্য মানুষ ও জ্বিনের দায়িত্বে আরোপ করা হয়েছে। তারা প্রত্যেকটি কথা ও কর্ম এবং উঠা ও বসার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। তারা তাদের দায়িত্ব পালন না করলে পরকালে কঠোর শাস্তির যোগ্য হবে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ ও জ্বিনকে অধিকারও সবচেয়ে বেশি দিয়েছেন। পরস্পরভাবে মানুষের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে

যে, যার দায়িত্ব ও কর্তব্য অপরের তুলনায় বেশি, তার অধিকারও বেশি। মনুষ্যকুলের মধ্যে সর্বাধিক দায়িত্ব যেহেতু পয়গম্বরগণের উপর আরোপিত হয়েছে, তাই তাঁদেরকে অধিকারও অন্যদের তুলনায় বেশি দেওয়া হয়েছে।

আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায়ও আল্লাহ্ তা'আলা এই মাপকাঠির প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি যতটুকু দায়িত্ব বহন করে, তাকে ততটুকু অসুবিধা প্রদান করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বলা বাহুল্য, মানুষের কর্তব্যে সমতা আনয়ন করা একেবারে অসম্ভব এবং তাতে তফাৎ হওয়া অপরিহার্য। এটা কিছুতেই হতে পারে না যে, প্রত্যেকের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পূর্ণ অপরের সমান হবে। কেননা, আর্থ-সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য মানুষের সৃষ্টিগত যোগ্যতা ও প্রতিভার উপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে দৈহিক শক্তি, স্বাস্থ্য, বিবেক, বয়স, মেধা, দক্ষতা, কর্মতৎপরতা ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেকেই খোলা চোখে অবলোকন করতে পারে যে, এসব গুণের দিক দিয়ে সকল মানুষের মধ্যে সমতা সৃষ্টি করার সাধ্য সর্বাধিক উন্নত সমাজতান্ত্রিক সরকারেরও নেই। মানুষের যোগ্যতা ও প্রতিভার মধ্যে যখন পার্থক্য অপরিহার্য, তখন তাদের কর্তব্যেও পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী হবে। অর্থনৈতিক অধিকার কর্তব্যের উপরই নির্ভরশীল বিধায় আমদানী-তেও পার্থক্য হওয়া অপরিহার্য। কেননা কর্তব্যে পার্থক্য রেখে যদি সকলের আমদানী সমান করে দেওয়া হয়, তবে এর মাধ্যমে কখনও ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। এমতাবস্থায় কিছু লোকের আমদানী তাদের কর্তব্যের তুলনায় বেশি এবং কিছু লোকের কম হবে, যা সুস্পষ্ট অবিচার। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, আমদানীতে পূর্ণ সাম্য কোন যুগেই ইনসাফভিত্তিক হতে পারে না। সুতরাং সমাজ-তন্ত্র তার চরম উন্নতির যুগে (পূর্ণ মাত্রায় সাম্যবাদের যুগে) যে সাম্যের দাবি করে, তা কোন অবস্থাতেই গ্রহণীয় ও ইনসাফভিত্তিক নয়। তবে কার কর্তব্য বেশি, কার কম এবং এ হারে কার কতটুকু অধিকার হওয়া উচিত, এটা নির্ধারণ করা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুরূহ ও কঠিন কাজ। এটা সঠিকভাবে নির্ধারণ করার জন্য মানুষের কাছে কোন মাপকাঠি নেই। মাঝে মাঝে দেখা যায় একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার এক ঘন্টায় এত টাকা আয় করে, যা একজন অদক্ষ শ্রমিক সারাদিন অনেক মণ মাটি বয়েও আয় করতে পারে না। কিন্তু ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখলে এক তো শ্রমি-কের সারাদিনের স্বাধীন পরিশ্রম ইঞ্জিনিয়ারকে প্রদত্ত গুরু দায়িত্বের সমান হতে পারে না, এছাড়া ইঞ্জিনিয়ারের আমদানী কেবল এক ঘন্টার পরিশ্রমের প্রতিদান নয়; বরং এতে বছরের পর বছর মস্তিষ্ক ক্ষয় ও অধ্যবসায়ের প্রতিদানেরও অংশ আছে, যা সে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা অর্জনে ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং তাতে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জনে সহ্য করেছে। সমাজতন্ত্র তার প্রাথমিক স্তরে আয়ের এই পার্থক্য স্বীকার করে নিয়েছে।

---

১. সমাজতন্ত্রের বক্তব্য এই যে, আমদানীতে পুরোপুরি সাম্য আনয়ন করা যদিও তাৎক্ষণিক-ভাবে সম্ভবপর নয়, কিন্তু সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক মূলনীতিসমূহ পালন অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে এমন এক যুগ আসবে, যখন আমদানীতে পুরোপুরি সাম্য অথবা মালিকানায় পুরোপুরি অভিন্নতা সৃষ্টি হয়ে যাবে। সেটা হবে পূর্ণ মাত্রায় সাম্যবাদের যুগ।

সেমতে সকল সমাজতান্ত্রিক দেশে জনসংখ্যার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বেতনের বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু এ ব্যাপারেই তাদের পদস্খলন ঘটেছে যে, উৎপাদনের সকল উৎস সরকারের তহবিলে দিয়ে জনগণের কর্তব্য নির্ধারণ ও তদনুযায়ী আমদানী বন্টনের কাজও সরকারের কাছে ন্যস্ত করেছে। অথচ উপরে বর্ণিত রয়েছে যে, কর্তব্য ও অধিকারের মধ্যে অনুপাত কায়েম রাখার জন্য মানুষের কাছে কোন মাপকাঠি নেই। সমাজতন্ত্রের কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী সারা দেশের মানুষের জীবিকা নির্ধারণের কাজ সরকারের কতিপয় কর্মীর হাতে এসে গেছে। তারা যাকে যতটুকু ইচ্ছা, দেওয়ার এবং যতটুকু ইচ্ছা, না দেওয়ার ক্ষমতা লাভ করেছে। প্রথমত এতে দুর্নীতি ও স্বজন প্রীতির জন্য প্রশস্ত ময়দান খোলা রয়েছে, যার সিঁড়ি বেয়ে আমলাতন্ত্র ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হয়। দ্বিতীয়ত যদি সরকারের সকল কর্মীকে ফেরেশতাও ধরে নেওয়া হয় এবং তারা বাস্তবিকই ন্যায় ও সুবিচারের ভিত্তিতে দেশে আমদানী বন্টন করতে আগ্রহী হয়, তবে তাদের কাছে এমন কোন মাপকাঠি আছে কি, যদ্দ্বারা তারা একজন ইঞ্জিনিয়ার ও একজন শ্রমিকের কর্তব্যের পার্থক্য এবং তদনুপাতে তাদের আমদানীর ইনসাফভিত্তিক পার্থক্য সম্পর্কে ফয়সালা দিতে পারে?

বাস্তব ঘটনা এই যে, এ বিষয়ের ফয়সালা মানব বুদ্ধির অনুভূতির উর্ধ্বে। তাই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ একে নিজের হাতে রেখেছেন। আলোচ্য وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ---আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইঙ্গিত করেছেন যে, এই পার্থক্য নির্ধারণের কাজ আমি মানুষকে সোপর্দ করার পরিবর্তে নিজের হাতে রেখেছি। এর অর্থ এখানে তাই যে, দুনিয়াতে প্রত্যেকের প্রয়োজন অপরের সাথে জড়িত করে দেওয়া হয়েছে। ফলে প্রত্যেকেই নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অপরকে ততটুকু দিতে বাধ্য, যতটুকুর সে যোগ্য। এখানেও পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার উপর ভিত্তিশীল আমদানী ও রপ্তানীর ব্যবস্থা প্রত্যেকের আমদানী নির্ধারণ করে। অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজে ফয়সালা করে যে, যতটুকু কর্তব্য সে নিজ দায়িত্বে নিয়েছে, তার কতটুকু বিনিময় তার জন্য যথেষ্ট। এর কম পাওয়া গেলে সে সেই কাজ করতে সম্মত হয় না এবং বেশি চাইলে প্রতিপক্ষ তাকে কাজে নিয়োজিত করে না। لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ---বাক্যের অর্থ তাই যে, আমি আমদানীতে পার্থক্য এ কারণে রেখেছি, যাতে একজন অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নেয়। নতুবা সকলের আমদানী সমান হলে কেউ কারও কোন কাজে আসত না।

তবে কতক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই বড় বড় পুঁজিপতিরা আমদানী ও রপ্তানীর এই প্রাকৃতিক ব্যবস্থা থেকে অবৈধ ফায়দা লুটতে পারে, তা গরীবদেরকে তাদের প্রকৃত প্রাপ্য অপেক্ষা কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য করতে পারে। ইসলাম প্রথমত হালাল-হারাম ও জায়েয-নাজায়েযের সুদূরপ্রসারী বিধি-বিধানের সাহায্যে এবং দ্বিতীয়ত নৈতিক আচরণাবলী ও পরকাল চিন্তার মাধ্যমে এহেন পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পথে বাধার প্রাচীর গড়ে তুলেছে। যদি কখনও কোন স্থানে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে যায়, তবে ইসলাম রাষ্ট্রকে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সীমা পর্যন্ত মজুরি নির্ধারণের ক্ষমতা দান করেছে। বলা বাহুল্য, এটা কেবল অস্বাভাবিক পরিস্থিতি পর্যন্ত সীমিত বিধায় এর জন্য উৎপাদনের সকল উৎস সরকারের হাতে সমর্পণ করার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, এর ক্ষতি উপকারের তুলনায় অনেক বেশি।

ইসলামী সাম্যের অর্থ ঃ উল্লিখিত ইঙ্গিতসমূহ থেকে এ কথা স্পষ্টরূপে ফুটে উঠে যে, আমদানীতে পুরোপুরি সাম্য ন্যায় ও সুবিচারের দাবি নয়। এ সাম্য কার্যত কোথাও কায়েম হয়নি এবং হতে পারে না। এটা ইসলামেরও কাম্য নয়। তবে ইসলাম আইন, সামাজিকতা ও অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে। এর অর্থ এই যে, উল্লিখিত প্রাকৃতিক কর্মপদ্ধতি অনুসারে যার যতটুকু অধিকার নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তা অর্জন করার আইনগত ও সমাজগত অধিকারে সকলেই সমান। এ বিষয়ের কোন অর্থ হয় না যে, একজন ধনী, প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ও পদাধিকারী ব্যক্তি তার অধিকার সসম্মানে ও সহজে অর্জন করবে, আর গরীব বেচারী তার অধিকার অর্জনের জন্য দ্বারে দ্বারে ধাক্কা খেয়ে ফিরবে এবং লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে, আইন ধনীর অধিকার সংরক্ষণ করবে আর গরীবদের বেলায় আইনের বাণী নিভৃতে কাঁদবে। এ বিষয়টি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খলীফা হওয়ার পর এক ভাষণে তুলে ধরেছিলেন ঃ والله ما عندى أقوى من الضعيف حتى اخذ الحق له ولا عندى اضعف من القوى حتى اخذ الحق منه—অর্থাৎ আমি যে পর্যন্ত দুর্বলের অধিকার আদায় করে না দেই, সে পর্যন্ত আমার কাছে দুর্বল অপেক্ষা শক্তিশালী কেউ নেই এবং আমি যে পর্যন্ত সবলের কাছ থেকে অধিকার আদায় না করি, সে পর্যন্ত সবল অপেক্ষা দুর্বল আমার কাছে কেউ নেই।

এমনিভাবে নির্ভেজাল অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণে ইসলামী সাম্যের অর্থ এই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেকেই উপার্জনের সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে। ইসলাম এটা পছন্দ করে না যে, কয়েকজন বড় বড় ধনপতি ধনসম্পদের উৎস মুখ দখল করে নিজেদের ইজারাদারী প্রতিষ্ঠিত করে নেবে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য বাজারে বসাও দুরূহ করে তুলবে। সেমতে সুদ, ফটকাবাজি, জুয়া মজুদদারি এবং ইজারাদারী ভিত্তিক বাণিজ্যিক চুক্তি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এছাড়া যাকাত, ওশর, খারাজ, ভরণ-পোষণের ব্যয়, দান-খয়রাত ও অন্যান্য কর আরোপ করে এমন পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে, যাতে প্রত্যেক মানুষ তার ব্যক্তিগত যোগ্যতা, শ্রম ও পুঁজি অনুপাতে

উপার্জনের উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে সক্ষম হয় এবং এর ফলশ্রুতিতে একটি সুখী সমাজ গড়ে উঠতে পারে। এতসবের পরেও আমদানীতে যে পার্থক্য থেকে যাবে, তা প্রকৃতপক্ষে অপরিহার্য। মনুষ্যকুলের মধ্যে যেমন রূপ, সৌন্দর্য, শক্তি, স্বাস্থ্য, জ্ঞানবুদ্ধি, মেধা, সন্তান-সন্ততির বিদ্যমান পার্থক্য মেটানো সম্ভবপর নয়, তেমনি এ পার্থক্যও বিলোপ হওয়ার নয়।

وَلَوْلَآ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ
لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ۝ وَلِبُيُوْتِهِمْ
اَبْوَابًا وَّسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِـُٔوْنَ ۝ وَزُخْرُفًا ۭ وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا
مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۭ وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

(৩৩) যদি সব মানুষের এক মতাবলম্বী হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত, তবে যারা দয়াময় আল্লাহকে অস্বীকার করে আমি তাদেরকে দিতাম তাদের গৃহের জন্যে রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি, যার উপর তারা চড়ত (৩৪) এবং তাদের গৃহের জন্য দরজা দিতাম এবং পালংক দিতাম, যাতে তারা হেলান দিয়ে বসত। (৩৫) এবং স্বর্ণ-নির্মিতও দিতাম। এগুলো সবই তো পার্থিব জীবনের ভোগ সামগ্রী মাত্র। আর পরকাল আপনার পালনকর্তার কাছে তাদের জন্যেই যারা ভয় করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কাফিররা ধন-সম্পদের প্রাচুর্যকে নবুয়ত লাভের শর্ত মনে করে, অথচ নবুয়ত এক মহান বিষয়---এর যোগ্যতার শর্তও মহানই হওয়া উচিত। পার্থিব ধন-দৌলত ও প্রভাব-প্রতিপত্তি আমার কাছে এত নিকৃষ্ট যে,) যদি (প্রায়) সব মানুষের এক মতাবলম্বী (অর্থাৎ কাফির) হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত, তবে যারা আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করে, (ফলে আল্লাহ্‌র কাছে খুব ঘৃণিত হয়) আমি তাদেরকে দিতাম তাদের গৃহের জন্য রৌপ্য নির্মিত ছাদ, (রৌপ্য নির্মিত) সিঁড়ি যার উপর তারা উঠত (ও নামত) এবং তাদের গৃহের জন্য (রৌপ্য নির্মিত) দরজা দিতাম এবং (রৌপ্য নির্মিত) পালংক দিতাম, যাতে তারা হেলান দিয়ে বসত এবং (এসব বস্তুই) স্বর্ণ নির্মিতও দিতাম। (অর্থাৎ কিছু রৌপ্য ও কিছু স্বর্ণ নির্মিত দিতাম (কিন্তু এসব আসবাবপত্র সকল কাফিরকে এজন্য দেওয়া হয়নি যে, অধিকাংশ মানুষের স্বভাবে ধন-সম্পদের লালসা প্রবল। কাজেই এসব আসবাবপত্র কুফরের নিশ্চিত কারণ হয়ে যেত। ফলে অল্প সংখ্যক লোক বাদে প্রায় সকলেই কুফরী অবলম্বন করত।

তাই সকল কাফিরকে এই ঐশ্বর্য দান করিনি। এই উপযোগিতা লক্ষ্য না হলে তাই করতাম। বলা বাহুল্য, শত্রুকে মূল্যবান বস্তু দেওয়া হয় না। এ থেকে জানা গেল যে, পার্থিব ধন-সম্পদ প্রকৃতপক্ষে কোন মহৎ বস্তু নয়। কাজেই এটা নবুয়তের ন্যায় মহান পদের যোগ্যতার শর্তও হতে পারে না। পক্ষান্তরে নবুয়তের শর্ত হচ্ছে কতিপয় উচ্চস্তরের নৈপুণ্য, যা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে পয়গম্বরগণকে দান করা হয়। এসব নৈপুণ্য মুহাম্মদ (সা)-এর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং নবুয়ত তাঁর জন্যই শোভনীয়—মক্কা ও তায়েফের সর্দারদের জন্য নয়।) এগুলো সবই (অর্থাৎ উল্লিখিত আসবাবপত্র) তো পার্থিব জীবনের ভোগ-সামগ্রী মাত্র। আর পরকাল (যা চিরন্তন ও তদপেক্ষা উত্তম, তা) আপনার পালনকর্তার কাছে আল্লাহ্ ভীরুদের জন্যেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ধন-দৌলতের প্রাচুর্য শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নয়ঃ কাফিররা বলেছিল, মক্কা ও তায়েফের কোন বড় ধনাঢ্য ব্যক্তিকে পয়গম্বর করা হল না কেন? আলোচ্য আয়াতসমূহে এর দ্বিতীয় জওয়াব দেওয়া হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, নিঃসন্দেহে নবুয়তের জন্য কিছু যোগ্যতা ও শর্ত থাকা জরুরী। কিন্তু ধন-দৌলতের প্রাচুর্যের ভিত্তিতে কাউকে নবুয়ত দেওয়া যায় না। কেননা, ধন-দৌলত আমার দৃষ্টিতে এত নিকৃষ্ট ও হেয় যে, সব মানুষের কাফির হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকলে আমি সব কাফিরের উপর স্বর্ণ-রৌপ্যের বৃষ্টি বর্ষণ করতাম। তিরমিযীর এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء—অর্থাৎ দুনিয়া যদি আল্লাহ্র কাছে মশার এক পাখার সমানও মর্যাদা রাখত, তবে আল্লাহ্ তা'আলা কোন কাফিরকে দুনিয়া থেকে এক ঢোক পানিও দিতেন না। এ থেকে জানা গেল যে, ধন-সম্পদের প্রাচুর্যও কোন শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নয় এবং এর অভাবও মানুষের মর্যাদাহীন হওয়ার আলামত নয়। তবে নবুয়তের জন্য কতিপয় উচ্চস্তরের গুণ থাকা অত্যাবশ্যক। সেগুলো মুহাম্মদ (সা)-এর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই কাফিরদের আপত্তি সম্পূর্ণ অসার ও বাতিল।

আয়াতে 'সব মানুষ কাফির হয়ে যেত' এর অর্থ বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কাফির হয়ে যেত। নতুবা আল্লাহ্র কিছু বান্দাহ আজও আছে, যারা বিশ্বাস করে যে, কুফরী অবলম্বন করে তারা ধন-দৌলতে স্নাত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তারা ধন-দৌলতের খাতিরে কুফরী অবলম্বন করে না। এরূপ কিছু লোক সম্ভবত তখনও ঈমানকে আঁকড়ে থাকত। কিন্তু তাদের সংখ্যা হত আটার মধ্যে লবণের তুল্য।

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ﴿٣٦﴾ وَاِنَّهُمْ
لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٣٧﴾ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَنَا

قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ ﴿٣٨﴾ وَلَنْ
يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٣٩﴾ اَفَاَنْتَ
تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِى الْعُمْىَ وَمَنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٠﴾ فَاِمَّا
نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ ﴿٤١﴾ اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِىْ وَعَدْنٰهُمْ
فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ ﴿٤٢﴾ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِىْ اُوْحِىَ اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلٰى
صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤٣﴾ وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْـَٔلُوْنَ ﴿٤٤﴾ وَسْـَٔلْ
مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَآ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ
اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ ﴿٤٥﴾

(৩৬) যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতপর সে-ই হয় তার সঙ্গী। (৩৭) শয়তানরাই মানুষকে সৎপথে বাধা দান করে, আর মানুষ মনে করে যে, তারা সৎপথে রয়েছে। (৩৮) অবশেষে যখন সে আমার কাছে আসবে, তখন সে শয়তানকে বলবে, হায়, আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্ব থাকত! কত হীন সঙ্গী সে! (৩৯) তোমরা যখন কুফর করছিলে, তখন তোমাদের আজকে আযাব শরীক হওয়া কোন কাজে আসবে না। (৪০) আপনি কি বধিরকে শোনাতে পারবেন? অথবা যে অন্ধ ও যে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত, তাকে পথ প্রদর্শন করতে পারবেন? (৪১) অতপর আমি যদি আপনাকে নিয়ে যাই, তবু আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেব। (৪২) অথবা যদি আমি তাদেরকে যে আযাবের ওয়াদা দিয়েছি, তা আপনাকে দেখিয়ে দেই, তবু তাদের উপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। (৪৩) অতএব আপনার প্রতি যে ওহী নাযিল করা হয়, তা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করুন। নিঃসন্দেহে আপনি সরল পথে রয়েছেন। (৪৪) এটা আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য উল্লিখিত থাকবে এবং শীঘ্রই আপনারা জিজ্ঞাসিত হবেন। (৪৫) আপনার পূর্বে আমি যেসব রসূল প্রেরণ করেছি, তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, দয়াময় আল্লাহ্ ব্যতীত আমি কি কোন উপাস্য স্থির করেছিলাম ইবাদতের জন্যে?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপদেশ (অর্থাৎ কোরআন ও ওহী) থেকে (জেনেশুনে) অন্ধ হয়ে যায়, (যেমন, কাফিররা পর্যাপ্ত ও সন্তোষজনক প্রমাণাদি সত্ত্বেও মূর্খ সাজে) আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতপর সে-ই হয় তার (সর্বকালীন) সহচর। তারাই (অর্থাৎ এসব সহচর শয়তানরাই) তাদেরকে (অর্থাৎ, কোরআন থেকে বিমুখ মানুষকে সর্বদা) সৎপথে বাধাদান করে। (নিয়োজিত করার এটাই ফল।) আর তারা (সৎপথ থেকে দূরে থাকা সত্ত্বেও) মনে করে যে, তারা সৎপথে আছে। (অতএব এরূপ লোকদের সৎপথে আসার আশা নেই। কাজেই আপনি দুঃখ করবেন না এবং মনে সান্ত্বনা রাখুন যে, তাদের এ গাফলতি সত্বরই দূর হবে। তারা সত্বরই নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে। কেননা, এটা কেবল দুনিয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ।) অবশেষে যখন সে আমার কাছে আসবে (এবং তার ভুল প্রকাশ পাবে), তখন (সহচর শয়তানকে) বলবে, হায়, আমার ও তোমার মধ্যে যদি (দুনিয়াতে) পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব থাকত (কেননা, তুমি) ছিলে নিকৃষ্ট সহচর! (তুমিই তো আমাকে পথভ্রষ্ট করেছিলে, কিন্তু এ পরিতাপ তখন কাজে আসবে না। এ ছাড়া তাদেরকে বলা হবে,) তোমরা যখন (দুনিয়াতে) কুফর করেছ, তখন আজ যেমন পরিতাপ তোমাদের উপকারে আসেনি তেমনি) আজকের এ বিষয়টিও (অর্থাৎ তোমার ও শয়তানের) আযাবে শরীক হওয়া তোমাদের কোন উপকারে আসবে না। (দুনিয়াতে মাঝে মাঝে অন্যদেরকেও নিজের মত বিপদে শরীক দেখে যেমন, এক প্রকার সান্ত্বনা লাভ হয়, জাহান্নামে তা হবে না। কারণ, জাহান্নামের আযাব হবে খুব তীব্র। অপরের দিকে ভ্রূক্ষেপও হবে না। প্রত্যেকেই নিজেকে সর্বাধিক আযাবে লিপ্ত মনে করবে।) অতএব (আপনি যখন জানলেন যে, তাদের হিদায়তের কোন আশা নেই, তখন) আপনি কি (এমন) বধিরকে শুনাতে পারবেন? অথবা যে অন্ধ ও যে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত, তাকে পথে আনতে পারবেন? (অর্থাৎ তাদের হিদায়ত আপনার ইখতিয়ারের বাইরে।) অতপর (তাদের এই অবাধ্যতার কারণে অবশ্যই শাস্তি হবে---আপনার জীবদ্দশায় অথবা ওফাতের পরে। সুতরাং) আমি যদি আপনাকে (দুনিয়া থেকে) নিয়ে যাই, তবুও আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেব, অথবা যদি আমি তাদেরকে যে আযাবের ওয়াদা দিয়েছি তা (আপনার জীবদ্দশায় তাদের উপর নাযিল করে) আপনাকে তা দেখিয়ে দেই, তবুও (অবান্তর নয়। কেননা) তাদের উপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। (অর্থাৎ আযাব অবশ্যই হবে---যখনই হোক। অতএব আপনি সান্ত্বনা রাখুন এবং নিশ্চিন্তে) কোরআনকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করুন, যা আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে নাযিল করা হয়েছে। (কেননা) আপনি নিঃসন্দেহে সরল পথে আছেন। (অর্থাৎ নিজের কাজ করে যান, অপরের কাজের জন্য দুঃখ করবেন না।) এ কোরআন (যা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে,) আপনার জন্য ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য খুব সম্মানের বস্তু। (কারণ, এতে আপনাকে প্রত্যক্ষভাবে এবং আপনার সম্প্রদায়কে পরোক্ষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। সাধারণ

রাজা-বাদশাহ্‌র সাথে কথা বলাকে সম্মানের বিষয় মনে করা হয়। রাজাধিরাজ আল্লাহ্ যার সাথে কথা বলেন, তার তো সম্মানের অন্তই থাকে না।) শীঘ্রই (কিয়ামতের দিন) তোমরা (নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে) জিজ্ঞাসিত হবে। (আপনাকে কেবল তবলীগ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, যা আপনি পূর্ণরূপে সম্পাদন করেছেন। আর তাদেরকে কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। সুতরাং তাদের কর্ম সম্পর্কে যখন আপনি জিজ্ঞাসিত হবেন না, তখন আপনার চিন্তা কিসের? আমার অবতীর্ণ ওহীতে তওহীদ সম্পর্কেই কাফিরদের বড় আপত্তি। প্রকৃতপক্ষে এর সত্যতার ব্যাপারে সকল পয়গম্বরই একমত। সেমতে আপনি যদি চান, তবে) আপনার পূর্বে আমি যেসব পয়গম্বর প্রেরণ করেছি, তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন (অর্থাৎ তাদের অবশিষ্ট কিতাব ও সহীফায় অনুসন্ধান করে দেখুন), দয়াময় আল্লাহ্ ব্যতীত (কোন সময়) আমি কি কোন উপাস্য স্থির করেছিলাম তাদের ইবাদত করার জন্য? (এতে উদ্দেশ্য অপরকে শুনানো যে, কেউ চাইলে অনুসন্ধান করে দেখুক। কিতাবে খুঁজে দেখাকে "পয়গম্বরগণকে জিজ্ঞাসা করুন" বলে ব্যক্ত করার উদ্দেশ্য কাফিরদের অক্ষমতা ফুটিয়ে তোলা।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিমুখতা কুসংসর্গের কারণ ঃ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ—উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপদেশ অর্থাৎ কোরআন ও ওহী থেকে জেনেশুনে বিমুখ হয়, আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই। সে দুনিয়াতেও তার সহচর হয়ে থাকে এবং তাকে সৎকর্ম থেকে নিবৃত্ত করে, কুকর্মে উৎসাহিত করে এবং পরকালেও যখন সে কবর থেকে উত্থিত হবে, তখন তার সঙ্গে থাকবে। অবশেষে উভয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (কুরতুবী) এ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিমুখতার এতটুকু শাস্তি দুনিয়াতেই পাওয়া যায় যে, তার সংসর্গ খারাপ হয়ে যায় এবং মানুষ-শয়তান অথবা জ্বিন-শয়তান তাকে সৎকর্ম থেকে দূরে সরিয়ে অসৎ কর্মের নিকটবর্তী করে দেয়। সে পথভ্রষ্টতার যাবতীয় কাজ করে, অথচ মনে করে যে, খুব ভাল কাজ করছে। (কুরতুবী) এখানে যে শয়তানকে নিয়োজিত করার কথা বলা হয়েছে, সে সেই শয়তান থেকে ভিন্ন, যে প্রত্যেক মু'মিন ও কাফিরের সাথে নিয়োজিত রয়েছে। কেননা, সেই শয়তান মু'মিনের নিকট থেকে বিশেষ বিশেষ সময়ে সরেও যায়, কিন্তু এ শয়তান সদাসর্বদা জোঁকের মত লেগেই থাকে।—(বয়ানুল কোরআন)

وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ...—এ আয়াতের দু'রকম তফসীর হতে পারে—এক, যখন তোমাদের কুফর ও শিরক প্রমাণিত হয়ে গেছে, তখন পরকালে তোমাদের এ পরিতাপ কোন কাজে আসবে না যে, হায়, এই শয়তান যদি আমা থেকে দূরে থাকত।

কেননা, তখন তোমরা সবাই আযাবে শরীক থাকবে। এমতাবস্থায় اَنَّكُمْ فِى الْعَذَابِ -এর অর্থ হবে لا نفكم

দ্বিতীয় সম্ভাব্য তফসীর এই যে, সেখানে পৌঁছার পর তোমাদের ও শয়তানদের আযাবে শরীক হওয়া তোমাদের জন্য মোটেই উপকারী হবে না। দুনিয়াতে অবশ্য এরূপ হয় যে, একই বিপদে কয়েকজন শরীক হলে প্রত্যেকের দুঃখ কিছুটা হালকা হয় বলে, কিন্তু পরকালে যেহেতু প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকবে এবং কেউ কারও দুঃখ হটাতে পারবে না, তাই আযাবে শরীক হওয়া কোন উপকার দিবে না। এমতাবস্থায় انكم হবে ينفع ক্রিয়ার কর্তা।

সুখ্যাতিও ধর্মে পছন্দনীয়ঃ وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ (এ কোরআন আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য খুবই সম্মানের বস্তু।) ذكر -এর অর্থ এখানে সুখ্যাতি। উদ্দেশ্য এই যে, কোরআন পাক আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য মহা-সম্মান ও সুখ্যাতির কারণ। ইমাম রাযী বলেন, এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, সুখ্যাতি একটি কাম্য বিষয়। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এখানে একে অনুগ্রহস্বরূপ উল্লেখ করেছেন এবং এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আ) এই দোয়া করেছিলেন— وَاجْعَلْ لِّىْ لِسَانَ صِدْقٍ فِى الْاٰخِرِيْنَ —(তফসীরে কবীর) কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, সুখ্যাতি তখনই উত্তম, যখন তা জীবনের লক্ষ্য না হয়ে সৎকর্মের দৌলতে আপনা-আপনি অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে মানুষ যদি সুখ্যাতির লক্ষ্যেই সৎকর্ম করে, তবে এটা রিয়া, যা সৎকর্মের যাবতীয় উপকারিতা বিনষ্ট করে দেয় এবং পাপের বোঝা বড় হয়। আয়াতে "আপনার সম্প্রদায়" বলে কারও কারও মতে কোরাইশ গোত্রকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু আল্লামা কুরতুবী বলেন, এতে সমগ্র উম্মতকে বোঝানো হয়েছে। কোরআন পাক সকলের জন্যেই সম্মান ও সুখ্যাতির কারণ।

وَاسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا —(আপনার পূর্বে আমি যে সব পয়গম্বর প্রেরণ করেছি, আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন।) এখানে প্রশ্ন হয় যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ তো ওফাত পেয়ে গেছেন। তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করার আদেশ কিরূপে দেওয়া হল? কোন কোন তফসীরবিদ এর জওয়াবে বলেন যে, আয়াতের উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্ তা'আলা যদি মু'জিযাস্বরূপ পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণকে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দেন, তবে তাদেরকে একথা জিজ্ঞেস করুন। সেমতে মি'রাজ রজনীতে রসূলুল্লাহ্ (স)-র সকল পয়গম্বরের সাথে সাক্ষাৎ ঘটেছিল। কুরতুবী বর্ণিত

কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ্ (স) পয়গম্বরগণের ইমামত শেষে তাদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন। কিন্তু এসব রেওয়ায়েতের সনদ জানা যায়নি। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আয়াতের অর্থ এই যে, পয়গম্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব ও সহীফায় খুঁজে দেখুন এবং তাদের উম্মতের আলিমগণকে জিজ্ঞেস করুন। সেমতে বনী ইসরাঈলের পয়গম্বরগণের সহীফাসমূহে বিকৃতি সত্ত্বেও তওহীদের শিক্ষা ও শিরকের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের শিক্ষা আজ পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। উদাহরণত বর্তমান বাইবেলের কিছু বাক্য উদ্ধৃত করা হল।

বর্তমান তওরাতে আছেঃ—যাতে তুমি জান যে, খোদাওয়ান্দই খোদা, তিনি ব্যতীত কেউই নেই।----(এস্তেছনা—৩৫—৪)

শুন হে ইসরাঈল, খোদাওয়ান্দ আমাদেরই এক খোদা।----(এস্তেছনা ৪—৬)

হযরত আশিইয়া (আ)-এর সহীফায় আছেঃ

আমিই খোদাওয়ান্দ, অন্য কেউ নয়। আমাকে ছাড়া কোন খোদা নেই, যাতে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত লোকেরা জানে যে, আমাকে ছাড়া কেউ নেই, আমিই খোদা-ওয়ান্দ, আমাকে ছাড়া অন্য কেউ নেই।---(ইয়াহিয়া ৬—৫ঃ ৪৫)

হযরত ঈসা (আ)-র এ উক্তিও বর্তমান বাইবেলে রয়েছেঃ

"হে ইসরাঈল, শুন, খোদাওয়ান্দ আমাদের খোদা একই খোদওয়ান্দ। তুমি খোদাওয়ান্দ তোমার খোদাকে সমস্ত মনে সমস্ত প্রাণে এবং প্রিয় বিবেক ও সমগ্র শক্তি দ্বারা ভালবাস। (মরকাস ১২—২৯ মাত্তা ২২—৩৬)

বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার মোনাজাতে বলেছিলেনঃ

এবং চিরন্তন জীবন এই যে, তারা তুমি একক ও সত্য আল্লাহ্কে এবং ঈসা মসীহ্কে—যাকে তুমি প্রেরণ করেছ—চিনবে (ইউহান্না ৩—১৭)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٤٧﴾ وَمَا نُرِيهِم
مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۖ وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾
وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ ۖ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ۝ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ
فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِي ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ ۙ
وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ۝ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ
الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ۝ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا
فَاسِقِينَ ۝ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ فَجَعَلْنَاهُمْ
سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ۝

(৪৬) আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী দিয়ে ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে প্রেরণ করেছিলাম, অতপর সে বলেছিল, আমি বিশ্ব পালনকর্তার রসূল। (৪৭) অতপর সে যখন তাদের কাছে আমার নিদর্শনাবলী উপস্থাপন করল, তখন তারা হাস্য-বিদ্রূপ করতে লাগল। (৪৮) আমি তাদেরকে যে নিদর্শনই দেখাতাম তা-ই হত পূর্ববর্তী নিদর্শন অপেক্ষা বৃহৎ এবং আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম, যাতে তারা ফিরে আসে। (৪৯) তারা বলল, হে যাদুকর, তুমি আমাদের জন্য তোমার পালন-কর্তার কাছে সে বিষয় প্রার্থনা কর, যার ওয়াদা তিনি তোমাকে দিয়েছেন; আমরা অবশ্যই সৎপথ অবলম্বন করব। (৫০) অতপর যখন আমি তাদের থেকে আযাব প্রত্যাহার করে নিলাম, তখনই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে লাগলো। (৫১) ফিরাউন তার সম্প্রদায়কে ডেকে বলল, হে আমার কওম, আমি কি মিসরের অধিপতি নই? এই নদীগুলো আমার নিম্নদেশে প্রবাহিত হয়, তোমরা কি দেখ না? (৫২) আমি যে শ্রেষ্ঠ এ ব্যক্তি থেকে, যে নীচ এবং কথা বলতেও সক্ষম নয়। (৫৩) তাকে কেন স্বর্ণবলয় পরিধান করানো হল না অথবা কেন আসল না তার সঙ্গে ফেরেশতাগণ দল বেঁধে? (৫৪) অতপর সে তার সম্প্রদায়কে বোকা বানিয়ে দিল, ফলে তারা তার কথা মেনে নিল। নিশ্চয় তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়। (৫৫) অতপর যখন আমাকে রাগান্বিত করল, তখন আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং নিমজ্জিত করলাম তাদের সবাইকে। (৫৬) অতপর আমি তাদেরকে করে দিলাম অতীত লোক ও দৃষ্টান্ত পরবর্তীদের জন্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি মূসা (আ)-কে আমার প্রমাণাদি (অর্থাৎ লাঠি ও জ্যোতির্ময় হাতের মু'জিযা দিয়ে ফিরাউন ও তার পারিদবর্গের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। অতপর তিনি (তাদের কাছে এসে) বললেন, আমি বিশ্বপালনকর্তার পক্ষ থেকে (তোমাদের হিদায়তের জন্য) রসূল (হয়ে এসেছি। কিন্তু ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গ মানল না)। অতপর (আমি অন্যান্য প্রমাণ শাস্তির আকারে তার নবুয়ত সপ্রমাণ করার জন্য প্রকাশ করলাম। অর্থাৎ, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি দিলাম। কিন্তু তাদের অবস্থা তবুও অপরিবর্তিত রইল এবং) যখন মূসা (আ) তাদের কাছে আমার (সেই) নিদর্শনাবলী উপস্থিত করল, তখনই তারা (মু'জিযাগুলোর কারণে) বিদ্রূপ করতে লাগল (যে, এগুলো কিসের মু'জিযা, কেবল মামূলী ঘটনাবলী। কেননা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি এমনিতেও হয়ে থাকে। কিন্তু এটা ছিল তাদের নির্বুদ্ধিতা। কারণ, অন্যান্য ইঙ্গিত থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে, এসব ঘটনা অস্বাভাবিক ও মু'জিযারূপে সংঘটিত হচ্ছে। এ কারণেই তারা তার প্রতি যাদুর অপবাদ আরোপ করেছিল। নিদর্শনগুলো এমন ছিল যে,) আমি তাদেরকে যে নিদর্শনই দেখাতাম, তা হত অন্য নিদর্শন অপেক্ষা বৃহৎ। (উদ্দেশ্য এই যে, সকল নিদর্শনই ছিল বৃহৎ। এরূপ অর্থ নয় যে, প্রত্যেক নিদর্শনই অপর নিদর্শন অপেক্ষা বৃহৎ ছিল। বাকপদ্ধতিতে কয়েক বস্তুর পূর্ণতা বর্ণনা করতে হলে এভাবেই বলা হয় যে, একটি থেকে একটি বড়। বাস্তবেও প্রত্যেক নিদর্শন পূর্ববর্তী নিদর্শন অপেক্ষা বৃহৎ হওয়া সম্ভবপর) এবং আমি তাদেরকে (এসব নিদর্শন স্থাপন করে) আযাব দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম, যাতে তারা (কুফর থেকে) ফিরে আসে। অর্থাৎ, নিদর্শনগুলো নবুয়তের প্রমাণও ছিল এবং তাদের জন্য শাস্তিও ছিল। কিন্তু তারা ফিরে এল না। অথচ প্রত্যেক নিদর্শন দেখার সময়ই তারা ফিরে আসার অঙ্গীকার কয়েকবার করেছিল) তারা (মূসা (আ)-কে প্রত্যেক নিদর্শনের পর) বলল, হে যাদুকর (এ শব্দটি পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী অধিক হতভম্বতার কারণে তাদের মুখ দিয়ে বের হয়ে থাকবে। নতুবা এমন সানুনয় আবেদনের সময় এই দুষ্টামিপূর্ণ শব্দ বলা অবান্তর মনে হয়। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, হে মূসা) তুমি আমাদের জন্য তোমার পালনকর্তার কাছে এ বিষয়ের দোয়া কর, যার ওয়াদা তিনি তোমাকে দিয়েছেন। (অর্থাৎ আমাদের অন্তরের মোহর দূর করে দেওয়ার দোয়া কর। আমরা অঙ্গীকার করছি যে, এ আযাব দূর হয়ে গেলে) আমরা অবশ্যই সৎপথ অবলম্বন করব। অতপর যখন আমি তাদের থেকে আযাব প্রত্যাহার করে নিলাম, তখনই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে লাগল। ফেরাউন (সম্ভবত মু'জিযা দেখে সবার মুসলমান হয়ে যাবার আশংকা করে) তার সম্প্রদায়কে ডেকে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, আমি কি মিসরের (ও তৎসংশ্লিষ্ট এলাকার) অধিপতি নই? (আর দেখ) এই নদীগুলো আমার (প্রাসাদের) নিম্নদেশে প্রবাহিত হচ্ছে। তোমরা কি (এসব বিষয়) দেখ না? (মূসার কাছে তো কিছুই নেই। এখন বল, আমি শ্রেষ্ঠ এবং অনুসরণযোগ্য, না মূসা?) বরং আমিই তো শ্রেষ্ঠ এ ব্যক্তি থেকে (অর্থাৎ, মূসা থেকে) যে (ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে) নীচ (লোক) এবং কথা বলতেও

অক্ষম। (সে যদি নিজেকে পয়গম্বর বলে, তবে) তাকে (অর্থাৎ, তার হাতে) কেন স্বর্ণবলয় পরিধান করানো হল না (যেমন, দুনিয়ার বাদশাহ্দের রীতি এই যে, কেউ কোন ব্যক্তির প্রতি বিশেষ কৃপা করলে তারা তাকে দরবারে-আমে স্বর্ণবলয় পরিধান করায়। উদ্দেশ্য এই যে, এ ব্যক্তি নবুয়ত পেয়ে থাকলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার হাতে স্বর্ণবলয় পরানো হত।) অথবা তার সাথে ফেরেশতাগণ দল বেঁধে আগমন করত (যেমন, শাহী ওমরাহদের মিছিল এমনিভাবে বের হয়।) মোটকথা সে (এসব কথাবার্তা বলে) তার সম্প্রদায়কে বোকা বানিয়ে দিল, ফলে তারা তার কথা মেনে নিল। তারা (পূর্ব থেকেও) ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়। (তাই ফেরাউনের কথার বেশি প্রতিক্রিয়া হল।) অতপর যখন তারা (উপর্যুপরি কুফর ও হঠকারিতা করে) আমাকে ক্রোধান্বিত করল, তখন আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদের সবাইকে নিমজ্জিত করলাম। অতপর আমি তাদেরকে করে দিলাম অতীত লোক ও পরবর্তী-দের জন্য দৃষ্টান্ত ("অতীত লোক" করার অর্থ এই যে, মানুষ তাদের কাহিনী স্মরণ করে একে অপরকে শিক্ষা দেয় যে, দেখ, আগেকার লোকদের মধ্যে এমন লোকও ছিল এবং তাদের এই অবস্থা ছিল)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত মূসা (আ)-র ঘটনা পূর্বে বারবার উল্লিখিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াত-সমূহে বর্ণিত ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা আ'রাফে বিবৃত হয়েছে। এখানে তাঁর ঘটনা স্মরণ করানোর উদ্দেশ্য এই যে, রসূলুল্লাহ (সা) ধনাঢ্য ছিলেন না বলে কাফিররা তাঁর নবুয়তে যে সন্দেহ করত, তা কোন নতুন নয়, বরং ফেরাউন ও তার সভাসদরা এমন সন্দেহ মূসা (আ)-র নবুয়তেও করেছিল। ফেরাউনের বক্তব্য ছিল এই যে, আমি মিসর সাম্রাজ্যের অধিপতি, আমার প্রাসাদসমূহের পাদদেশে নদ-নদী প্রবাহিত, ফলে আমি মূসা (আ) থেকে শ্রেষ্ঠ। কাজেই আমাকে বাদ দিয়ে সে কিরূপে নবুয়ত লাভ করতে পারে? কিন্তু তার এই সন্দেহ যেমন তার কোন কাজে আসল না, সে সম্প্রদায়সহ নিমজ্জিত হল, তেমনি মক্কার কাফিরদের আপত্তিও তাদেরকে ইহকাল ও পরকালের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দেবে না।

وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ---(এবং সে কথারও শক্তি রাখে না) যদিও মূসা (আ)-র দোয়ার ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মুখের তোতলামী দূর করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পূর্বাবস্থাই ফিরাউনের মনে ছিল। তাই সে মূসা (আ)-র প্রতি এই দোষ আরোপ করল। এখানে "কথা বলার শক্তি" বলে প্রমাণাদির সাবলীলতা ও প্রাঞ্জলতাও বোঝানো যেতে পারে। ফিরাউনের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আমাকে সন্তুষ্ট করার মত পর্যাপ্ত প্রমাণ মূসা (আ)-র কাছে নেই। অথচ এটা ছিল ফিরাউনের নিছক অপবাদ। নতুবা মূসা (আ) দলীল-প্রমাণের সাহায্যে ফিরাউনকে চূড়ান্তরূপে লা জওয়াব করে দিয়েছেন।---(তফসীরে কবীর, রূহুল মা'আনী)

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ—এর দু'রকম অনুবাদ হতে পারে। এক—ফিরাউন তার সম্প্রদায়কে সহজেই তার অনুগত করে নিল—طلب منهم الخفة فى مطا و عته—দুই—সে তার সম্প্রদায়কে বেওকুফ পেল و جد هم خفيفة ا حلا مهم—(রূহুল-মা'আনী)

فَلَمَّآ اٰسَفُوْنَا—এটা اسف থেকে উদ্ভূত। আভিধানিক অর্থ অনুতাপ। কাজেই বাক্যের শাব্দিক অর্থ, "অতপর যখন তারা আমাকে অনুতপ্ত করল। অনুতাপ ক্রোধের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাই এর পারিভাষিক অনুবাদ সাধারণত এভাবে করা হয়—যখন তারা আমাকে ক্রোধান্বিত করল। আল্লাহ্ তা'আলা অনুতাপ ও ক্রোধের প্রতিক্রিয়ামূলক অবস্থা থেকে পবিত্র। তাই এর অর্থ হবে, তারা এমন কাজ করল যদ্দরুন আমি তাদেরকে শাস্তিদানের সংকল্প গ্রহণ করলাম।—(রূহুল মা'আনী)

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ ﴿٥٧﴾ وَقَالُوْٓا ءَاٰلِهَتُنَا
خَيْرٌ اَمْ هُوَ ۭ مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًۢا ۭ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ ﴿٥٨﴾
اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِّبَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ
نَشَاۗءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلٰۗىِٕكَةً فِي الْاَرْضِ يَخْلُفُوْنَ ﴿٦٠﴾ وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ
لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ ۭ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦١﴾ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ
الشَّيْطٰنُ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٦٢﴾ وَلَمَّا جَاۗءَ عِيْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ قَدْ
جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِاُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ ۚ فَاتَّقُوا
اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿٦٣﴾ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۭ هٰذَا صِرَاطٌ
مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦٤﴾ فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ
ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ﴿٦٥﴾

(৫৭) যখনই মরিয়ম-তনয়ের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হল, তখনই আপনার সম্প্রদায় হট্টগোল শুরু করে দিল। (৫৮) এবং বলল, আমাদের উপাস্যরা শ্রেষ্ঠ, না সে? তারা

আপনার সামনে যে উদাহরণ উপস্থাপন করে তা কেবল বিতর্কের জন্যই করে। বস্তুত তারা হল এক বিতর্ককারী সম্প্রদায়। (৫৯) সে তো এক বান্দাই বটে, আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করেছি এবং তাকে করেছি বনী ইসরাঈলের জন্য আদর্শ। (৬০) আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের থেকে ফেরেশতা সৃষ্টি করতাম, যারা পৃথিবীতে একের পর এক বসবাস করত। (৬১) সুতরাং তা'হল কিয়ামতের নিদর্শন। কাজেই তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ করো না এবং আমার কথা মান। এটা এক সরল পথ। (৬২) শয়তান যেন তোমাদেরকে নিবৃত্ত না করে। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (৬৩) ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ আগমন করল, তখন বলল, আমি তোমাদের কাছে প্রজ্ঞা নিয়ে এসেছি এবং তোমরা যে কোন কোন বিষয়ে মতভেদ করছ তা ব্যক্ত করার জন্য এসেছি। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার কথা মান। (৬৪) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তা। অতএব তাঁর ইবাদত কর। এটা হল সরল পথ। (৬৫) অতপর তাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন দল মতভেদ সৃষ্টি করল। সুতরাং জালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক দিবসের আযাবের দুর্ভোগ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[একবার রসূলুল্লাহ্ (স) বলেছিলেন, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যায়ভাবে যাদের পূজা করা হয়, তাদের কারও মধ্যেই কল্যাণ নেই। একথা শুনে কুরাইশদের কেউ কেউ আপত্তি তুলল যে, খৃস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-র পূজা করে, অথচ তাঁর সম্পর্কে আপনিও বলেন যে, তিনি ছিলেন কল্যাণময়। এর জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,] যখন মরিয়ম-তনয় [ঈসা (আ)] সম্পর্কে (জনৈক আপত্তিকারীর পক্ষ থেকে) এক অদ্ভুত দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হল, (অদ্ভুত এ কারণে যে, বাহ্য দৃষ্টিতেই স্বয়ং তারা এর অসারতা জানতে পারত। সুতরাং বুদ্ধিমান হয়ে এরূপ আপত্তি করা অদ্ভুতই ছিল বটে। মোটকথা, যখন এই আপত্তি তোলা হয়,) তখন আপনার সম্প্রদায় আনন্দের আতিশয্যে হট্টগোল শুরু করে দিল এবং (আপত্তিকারীর সাথে একমত হয়ে) বলতে থাকে (বলুন, আপনার মতে) আমাদের উপাস্য দেবতাগুলো শ্রেষ্ঠ, না সে (অর্থাৎ ঈসা শ্রেষ্ঠ)? (উদ্দেশ্য এই যে, আপনি ঈসা (আ)-কে তো অবশ্যই শ্রেষ্ঠ মনে করেন, অথচ আপনিই বলেছিলেন যে, আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের পূজা করা হয়, তাদের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। কাজেই ঈসা (আ)-র মধ্যেও কোন কল্যাণ না থাকা জরুরী হয়ে পড়ে। সুতরাং আপনার উক্তি যথার্থ নয়। আরো জানা গেল যে, আপনি যাদেরকে শ্রেষ্ঠ বলেন, তাদেরও পূজা করা হয়েছে। এতে শিরকের বিশুদ্ধতাই প্রমাণিত হয়। অতপর এ আপত্তির প্রথমে সংক্ষেপে ও পরে বিস্তারিতভাবে জওয়াব দেওয়া হয়েছে। সংক্ষেপে এই ঃ) তারা কেবল বিতর্কের জন্যই এটা (অর্থাৎ অদ্ভুত আপত্তি) বর্ণনা করে (সত্যান্বেষণের খাতিরে নয়, নতুবা স্বয়ং তারাও এর অসারতা জানে। তাদের বিতর্ক কেবল এতেই সীমিত নয়), বরং তারা (অভ্যাসগতভাবেই) এক বিতর্ককারী সম্প্রদায়। (অধিকাংশ সত্য বিষয়ে বিতর্ক উদ্ভাবন করে। অতপর বিস্তারিত জওয়াব এই ঃ)

ঈসা (আ) তো এক বান্দাই বটে, যার প্রতি আমি (নবুয়ত দিয়ে) অনুগ্রহ করেছি এবং বনী ইসরাঈলের জন্য (প্রথমে ও অন্যদের জন্য পরে আমার) কুদরতের এক নমুনা করেছি (যাতে মানুষ বুঝে নেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা পিতা ছাড়াই সৃষ্টি করতে পারেন। এতে তাদের উভয় আপত্তির জওয়াব হয়ে গেছে। আমি তো আরও আশ্চর্যজনক কাজ করতে সক্ষম। সেমতে) আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের মধ্য থেকে ফেরেশতা সৃষ্টি করতাম (যেমন তোমাদের মধ্য থেকে সন্তান জন্মগ্রহণ করে। যারা পৃথিবীতে (মানুষের ন্যায়) একের পর এক বসবাস করত (অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু উভয়ই মানুষের মত হত। সুতরাং পিতা ব্যতীত সৃষ্টি করার দরুন জরুরী হয় না যে, ঈসা (আ) আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর ক্ষমতাধীন হবেন না। কাজেই এটা তার পূজনীয় হওয়ার দলীল নয়। বরং এভাবে সৃষ্টি করার এক রহস্য তো উপরে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় রহস্য এই যে,) তিনি (অর্থাৎ ঈসা, এভাবে জন্মগ্রহণ করার মধ্যে) কিয়ামতের (সম্ভাব্যতার) নিদর্শন। [অর্থাৎ ঈসা (আ)-র পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ একটি অস্বাভাবিক ঘটনা। এটা যখন সম্ভবপর হল, তখন কিয়ামতে পুনরুজ্জীবনের অস্বাভাবিক ঘটনাও সম্ভবপর। সুতরাং এতে কিয়ামত ও পরকাল বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়ে যায়) কাজেই তোমরা কিয়ামতে (অর্থাৎ তার বিশুদ্ধতায়) সন্দেহ করো না এবং (তওহীদ ও পরকাল ইত্যাদি ব্যাপারে) আমার কথা মান। এটা সরল পথ। শয়তান যেন তোমাদেরকে (এ পথে আসা থেকে) নিবৃত্ত না করে। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। [অতপর স্বয়ং ঈসা (আ)-র দাওয়াতের বিষয়বস্তুকে তওহীদের প্রমাণ ও শিরকের খণ্ডনে পেশ করা হয়েছে।] যখন ঈসা (আ) স্পষ্ট মু'জিযা নিয়ে আগমন করলেন, তখন (লোকদেরকে) বললেন, আমি তোমাদের কাছে প্রজ্ঞা নিয়ে এসেছি, (তোমাদের বিশ্বাস ঠিক করার জন্য) এবং তোমরা যে কোন কোন (হালাল ও হারাম কর্মের) বিষয়ে মতভেদ কর, তা ব্যক্ত করার জন্য এসেছি। (ফলে মতভেদ ও সন্দেহ দূর হয়ে যাবে।) অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর (এবং আমার নবুয়ত অস্বীকার করো না। এটা আল্লাহ্র বিরোধিতা) এবং আমার কথা মান। (তিনি আরও বললেন নিশ্চয়) আল্লাহ্ই আমার ও তোমাদের পালনকর্তা। অতএব (কেবল তাঁরই ইবাদত কর।) এটাই (তওহীদের) সরল পথ। অতপর [ঈসা (আ)-র এই স্পষ্ট বর্ণনা সত্ত্বেও] তাদের বিভিন্ন দল (এ সম্পর্কে) মতভেদ সৃষ্টি করল। (অর্থাৎ তওহীদের বিরুদ্ধে নানা রকম মযহাব তৈরি করে নিল। সেমতে তওহীদ সম্পর্কে খৃস্টান ও অখৃস্টানদের মতভেদ সুবিদিত।) সুতরাং জালিমদের (অর্থাৎ কিতাবী মুশরিক ও অকিতাবী মুশরিকদের) জন্য রয়েছে এক যন্ত্রণাদায়ক দিবসের আযাবের দুর্ভোগ। [ঈসা (আ)-র এই দাওয়াতে তওহীদের সমর্থন রয়েছে। সুতরাং তার অন্যায় পূজা দ্বারা শিরকের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করা—"বাদী নীরব-সাক্ষী সরব' এর মতই ব্যাপার নয় কি)!

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ—এসব আয়াতের

শানে নুযূলে তফসীরবিদগণ তিন প্রকার রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। প্রথম এই যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) কুরাইশদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ يا معشر قريش لا خير فى أحد يبعد من دون الله ---অর্থাৎ হে কুরাইশগণ, আল্লাহ্ ব্যতীত যারই ইবাদত করা হয়, তার মধ্যে কোন মঙ্গল নেই। কুরাইশরা বলল, খৃস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-র ইবাদত করে; কিন্তু আপনি নিজেই বলেন যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার সৎকর্মপরায়ণ বান্দা ও নবী ছিলেন। তাদের এই আপত্তির জওয়াবে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে।---(কুরতুবী)

দ্বিতীয় রেওয়ায়েত এই যে, কোরআন পাকের আয়াত — انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم — (তোমরা নিজেরা এবং তোমরা যেসব প্রতিমার পূজা কর, তারা জাহান্নামের ইন্ধন হবে) আয়াতটি অবতীর্ণ হলে আবদুল্লাহ্ ইবনুযযিবা'রা (যে তখনও কাফির ছিল) বলল, আমার কাছে এ আয়াতের চমৎকার জওয়াব রয়েছে। তা এই যে, খৃস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-র ইবাদত করে এবং ইহুদীরা হযরত ওযায়ের (আ)-এর পূজা করে। অতএব তাঁরা উভয়েই কি জাহান্নামের ইন্ধন হবে? একথা শুনে মুশরিক কুরাইশরা খুবই আনন্দিত হল। এর জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা — ان الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون আয়াত এবং সূরা যুখরুফের আলোচ্য আয়াত নাযিল করলেন।---(ইবনে কাসীর)

তৃতীয় রেওয়ায়েত এই যে, একবার মক্কার মুশরিকরা মিছা-মিছিই প্রচার করতে লাগল যে, মুহাম্মদ (সা) খোদায়ী দাবি করার ইচ্ছা রাখেন। তাঁর বাসনা এই যে, খৃস্টানরা যেমন হযরত ঈসা (আ)-র পূজা করে, এমনিভাবে আমরাও তাঁর পূজা করি। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। প্রকৃতপক্ষে রেওয়ায়েত তিনটির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কাফিররা সবগুলো কথাই বলে থাকবে, যার জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা এমন আয়াত নাযিল করেন, যাতে তিন আপত্তির জওয়াব হয়ে যায়। আয়াতসমূহে সর্বশেষ আপত্তির জওয়াব সুস্পষ্ট। কেননা, যারা হযরত ঈসা (আ)-র ইবাদত শুরু করেছে, তারা তা আল্লাহ্র কোন আদেশ বলে করেনি এবং ঈসা (আ)-রও বাসনা ছিল না, কোরআনও তাদের সমর্থন করে না। পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণের কারণে তারা ঈসা (আ) সম্পর্কে এই বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। কোরআন এ বিভ্রান্তি প্রবলভাবে খণ্ডন করে। এমতাবস্থায় এটা কেমন করে সম্ভবপর যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) খৃস্টানদের দেখাদেখি নিজেও খোদায়ী দাবি করে বসবেন?

প্রথম ও দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে কাফিরদের আপত্তির সারমর্ম প্রায় এক। আলোচ্য আয়াত থেকে এর জওয়াব এভাবে বের হয়, যারা জাহান্নামের ইন্ধন হবে এবং

যাদের মধ্যে কোন মঙ্গল নেই, তারা হয় নিষ্প্রাণ উপাস্য, যেমন, পাথরের মূর্তি, না হয় প্রাণী; কিন্তু নিজেই নিজের ইবাদতের আদেশ দেয় কিংবা তা পছন্দ করে, যেমন, শয়তান, ফিরাউন, নমরূদ প্রভৃতি। হযরত ঈসা (আ) তাদের অন্তর্ভুক্ত নন। কেননা, তিনি কোন পর্যায়ে নিজের ইবাদত পছন্দ করতেন না। খৃস্টানরা তাঁর কোন নির্দেশের কারণে তাঁর ইবাদত করে না, বরং তাঁকে আমি আমার কুদরতের এক নিদর্শন করে পিতা ব্যতীত সৃষ্টি করেছিলাম, যাতে মানুষ জানে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন মাধ্যম ব্যতিরেকেও সৃষ্টি করতে সক্ষম। কিন্তু খৃস্টানরা এর ভুল অর্থ নিয়ে তাকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে। অথচ এটা স্বয়ং ঈসা (আ)-র দাওয়াতের পরিপন্থী ছিল। তিনি সর্বদা তওহীদ শিক্ষা দিয়েছেন। মোটকথায়, ইবাদতে তাঁর অসন্তুষ্টির কারণে তাঁকে অন্যান্য উপাস্যের কাতারে শামিল করা যায় না।

এতে তফসীরের সারসংক্ষেপে বর্ণিত কাফিরদের আরও একটি আপত্তির জওয়াব হয়ে গেছে। তা এই যে, আপনি নিজে যাকে শ্রেষ্ঠ বলেন [অর্থাৎ ঈসা (আ)] তাঁরও তো ইবাদত হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের ইবাদত মন্দ নয়। আয়াতে এর জওয়াব সুস্পষ্ট যে, ঈসা (আ)-র ইবাদত আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছারও বিরুদ্ধে ছিল এবং স্বয়ং ঈসা (আ)-র দাওয়াতেরও পরিপন্থী ছিল। কাজেই এর মাধ্যমে শিরকের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করা যায় না।

وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ——এটা খৃস্টানদের সে বিভ্রান্তির জওয়াব, যার ভিত্তিতে তারা ঈসা (আ)-কে উপাস্য স্থির করেছিল। পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণের বিষয়টিকে তারা তাঁর খোদায়ীর প্রমাণস্বরূপ পেশ করেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা এর খণ্ডনে বলেন, এটা তো নিছক আমার কুদরতের এক প্রদর্শনী ছিল। আমি স্বভাবাতীত কাজ করারও ক্ষমতা রাখি। পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করা খুব বেশি স্বভাবাতীত কাজ নয়। কেননা হযরত আদমকে পিতা-মাতা ব্যতীত সৃষ্টি করা হয়েছে। আমি ইচ্ছা করলে এমন কাজও করতে পারি, যার নযীর এ পর্যন্ত কায়েম হয়নি। অর্থাৎ মানুষের ঔরসে ফেরেশতাও সৃষ্টি করতে পারি।

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ——[এবং নিঃসন্দেহে হযরত ঈসা (আ) কিয়ামতে বিশ্বাস স্থাপন করার একটি উপায়।] এর দু'রকম তফসীর করা হয়েছে। তফসীরের সারসংক্ষেপে উল্লিখিত প্রথম তফসীর এই যে, হযরত ঈসা (আ) অভ্যাসের বিপরীতে পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করেছেন, এটা এ বিষয়ের দলীল যে, আল্লাহ্ তা'আলা বাহ্যিক কারণ ব্যতিরেকেও মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মৃতদেরকে পুনরুজ্জীবন দান করা তাঁর জন্য মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, হযরত ঈসা (আ)-র পুনরায় আকাশ থেকে অবতরণ

কিয়ামতের আলামত। সেমতে শেষ যুগে তাঁর পুনরাগমন ও দাজ্জাল হত্যা মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। সূরা মায়েদায় এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ—(এবং যাতে আমি তোমাদের কোন কোন বিরোধপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করে দেই।) বনী ইসরাঈলের মধ্যে হঠকারিতা প্রবল আকার ধারণ করেছিল। তাই তারা কোন কোন বিধি-বিধান বিকৃত করে দিয়েছিল। হযরত ঈসা (আ) সেগুলোর স্বরূপ তুলে ধরেন। 'কোন কোন' বলার কারণ এই যে, কোন কোন বিষয় একান্তই পার্থিব ছিল। তাই তিনি সেগুলোর মতভেদ দূর করার প্রয়োজন মনে করেন নি।—(বয়ানুল কোরআন)

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾
الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾ يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ
عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٦٨﴾ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا
مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧٠﴾ يُطَافُ
عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ
الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧١﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي
أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا
تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٧٤﴾ لَا يُفَتَّرُ
عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٧٦﴾
وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ ﴿٧٧﴾

(৬৬) তারা কেবল কিয়ামতেরই অপেক্ষা করছে যে, আকস্মিকভাবে তাদের কাছে এসে যাবে এবং তারা খবরও রাখবে না। (৬৭) বন্ধুবর্গ সেদিন একে অপরের শত্রু হবে, তবে আল্লাহ্ভীরুরা নয়। (৬৮) হে আমার বান্দাগণ, তোমাদের আজ কোন

ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না। (৬৯) তোমরা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলে এবং তোমরা আজ্ঞাবহ ছিলে। (৭০) জান্নাতে প্রবেশ কর তোমরা এবং তোমাদের বিবিগণ সানন্দে। (৭১) তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র এবং তথায় রয়েছে মনে যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। তোমরা তথায় চিরকাল থাকবে। (৭২) এই যে জান্নাতের উত্তরাধিকারী তোমরা হয়েছ, এটা তোমাদের কর্মের ফল। (৭৩) তথায় তোমাদের জন্য আছে প্রচুর ফলমূল, তা থেকে তোমরা আহার করবে। (৭৪) নিশ্চয় অপরাধীরা জাহান্নামের আযাবে চিরকাল থাকবে। (৭৫) তাদের থেকে আযাব লাঘব করা হবে না এবং তারা তাতেই থাকবে হতাশ হয়ে। (৭৬) আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি ; কিন্তু তারাই ছিল জালিম। (৭৭) তারা ডেকে বলবে, হে মালিক, পালনকর্তা আমাদের কিস্‌সাই শেষ করে দিন। সে বলবে, নিশ্চয় তোমরা চিরকাল থাকবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা (সত্য সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও যে মিথ্যাকে আঁকড়ে আছে, এতে করে তারা) কেবল কিয়ামতেরই অপেক্ষা করছে যে, আকস্মিকভাবে তাদের কাছে এসে যাবে অথচ তারা খবরও রাখবে না। (তাদের অপেক্ষার অর্থ এই যে, তারা যেন চোখে না দেখে মানবে না। সেদিন কিয়ামতের ঘটনা এই যে,) বন্ধুবর্গ সেদিন একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ্‌ভীরুরা নয়। (কেননা সেদিন মিথ্যা বন্ধুত্বের ক্ষতি অনুভূত হবে। ফলে বন্ধুদের প্রতি ঘৃণা হবে। পক্ষান্তরে সত্য বন্ধুত্বের উপকার ও সওয়াব অনুভূত হবে। তাই তা অক্ষয় থাকবে। মু'মিনদেরকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বলা হবে---) হে আমার বান্দাগণ, আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না ; (অর্থাৎ সেই বান্দা,) যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং (জ্ঞানে ও কর্মে আমার) আজ্ঞাবহ ছিল। তোমরা এবং তোমাদের (মু'মিন) সহধর্মিণীরা আনন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর (জান্নাতে যাওয়ার পর) তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা (খাদ্যবস্তুতে পরিপূর্ণ) এবং গ্লাস (পানীয় দ্বারা পরিপূর্ণ স্বর্ণের অথবা অন্য কোন ধাতুর। এগুলো জান্নাতী বালকরা পরিবেশন করবে।) তথায় পাওয়া যাবে মনে যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। (তাদেরকে বলা হবে,) তোমরা তথায় চিরকাল থাকবে। (আরও বলা হবে,) তোমরা এই জান্নাতের মালিক হয়ে গেছ তোমাদের (সৎ) কর্মের বিনিময়ে। (তোমাদের কাছ থেকে কখনও এটি ফেরত নেওয়া হবে না) তথায় তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফলমূল, তা থেকে তোমরা আহার করবে। (এরপর কাফিরদের কথা বলা হয়েছে) নিশ্চয় অবাধ্যরা (অর্থাৎ কাফিররা) জাহান্নামের আযাবে চিরকাল থাকবে। তা (অর্থাৎ সে আযাব) তাদের থেকে লাঘব করা হবে না। তারা তাতেই হতাশ হয়ে পড়ে থাকবে। (অতপর আল্লাহ্‌ বলেন,) আমি তাদের প্রতি বিন্দুমাত্রও জুলুম করিনি (অর্থাৎ অন্যায়ভাবে আযাব দেইনি) কিন্তু তারাই ছিল জালিম (কুফর ও শিরক করে নিজেদের ক্ষতি

করেছে। অতপর তাদের অবশিষ্ট অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে) তারা (মৃত্যু কামনা করবে এবং জাহান্নামের রক্ষী মালিক ফেরেশতাকে) ডেকে বলবে, হে মালিক, (তুমিই দোয়া কর) তোমার পালনকর্তা আমাদের জীবনই শেষ করে দিন। সে (অর্থাৎ মালিক) বলবে, তোমরা চিরকাল (এভাবেই) থাকবে (মরবে না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রকৃত বন্ধুত্ব তা-ই, যা আল্লাহর ওয়াস্তে হয়ঃ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ——(আল্লাহ্ ভীরুদের ছাড়া সকল বন্ধুই সেদিন একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে।) এ আয়াত পরিষ্কার ব্যক্ত করেছে যে, মানুষ যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিয়ে দুনিয়াতে গর্ব করে এবং যার জন্য হালাল ও হারাম এক করে দেয়, কিয়ামতের দিন সে সম্পর্ক কেবল নিষ্ফলই হবে না, বরং শত্রুতায় পর্যবসিত হবে। হাফেয ইবনে কাসীর এ আয়াতের তফসীরে হযরত আলী (রা)-র উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, দুই মু'মিন বন্ধু ছিল এবং দুই কাফির বন্ধু। মু'মিন বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে একজনের ইন্তিকাল হলে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনানো হল। তখন তার আজীবন বন্ধুর কথা মনে পড়লে সে দোয়া করল,—ইয়া আল্লাহ্, আমার অমুক বন্ধু আমাকে আপনার ও আপনার রসূলের আনুগত্য করার আদেশ দিত, সৎ কাজে উৎসাহ দিত, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করত এবং আপনার সাথে সাক্ষাতের বিষয় স্মরণ করিয়ে দিত। কাজেই হে আল্লাহ্, আমার পরে তাকে পথভ্রষ্ট করবেন না, যাতে সেও জান্নাতের দৃশ্য দেখতে পারে, যা আপনি আমাকে দেখিয়েছেন। আপনি আমার প্রতি যেমন সন্তুষ্ট, তার প্রতিও তেমনি সন্তুষ্ট হোন। এই দোয়ার জওয়াবে তাকে বলা হবে, যাও, তোমার বন্ধুর জন্য আমি যে পুরস্কার ও সওয়াব রেখেছি, তা যদি তুমি জানতে পার তবে কাঁদবে কম, হাসবে বেশি। এরপর অপর বন্ধুর ইন্তিকাল হয়ে গেলে উভয়ের রূহ্ একত্রিত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বলবেন, তোমরা একে অপরের প্রশংসা কর। তখন তাদের প্রত্যেকেই অপরের সম্পর্কে বলবে, সে শ্রেষ্ঠ ভাই, শ্রেষ্ঠ সঙ্গী ও শ্রেষ্ঠ বন্ধু।

এর বিপরীতে কাফির বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে একজন মারা গেলে তাকে জাহান্নামের ঠিকানা জানানো হবে। তখন তার বন্ধুর কথা মনে পড়বে এবং সে দোয়া করবে, ইয়া আল্লাহ্, আমার অমুক বন্ধু আমাকে আপনার ও আপনার রসূলের অবাধ্যতা করার আদেশ দিত, মন্দ কাজে উৎসাহ দিত এবং ভাল কাজে বাধা দিত। সে আমাকে বলত যে, আমি কখনও আপনার কাছে হাযির হব না। কাজেই হে আল্লাহ্, আমার পরে তাকে হিদায়ত দেবেন না, যাতে সেও জাহান্নামের দৃশ্য দেখে, যা আপনি আমাকে দেখিয়েছেন। আপনি আমার প্রতি যেমন অসন্তুষ্ট, তেমনি তার প্রতিও অসন্তুষ্ট থাকুন। এরপর অপর বন্ধুরও মৃত্যু হয়ে যাবে এবং উভয়ের রূহ্

একত্রিত হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা একে অপরের সংজ্ঞা বর্ণনা কর। তখন তাদের প্রত্যেকেই পরস্পরের সম্পর্কে বলবে, সে নিকৃষ্ট ভাই, নিকৃষ্ট সঙ্গী এবং নিকৃষ্ট বন্ধু। এ কারণেই ইহকাল ও পরকাল—এ উভয় দিক বিচারে উৎকৃষ্ট বন্ধুত্ব তাই, যা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে হয়। যে দু'জন মুসলমানের মধ্যে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে বন্ধুত্ব হয়, তাদের ফযীলত ও মহত্ত্ব অনেক হাদীসে বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, হাশরের ময়দানে তারা আল্লাহ্‌র আরশের ছায়াতলে থাকবে। 'আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে' বন্ধুত্বের অর্থ অপরের সাথে কেবল সত্যিকার ধর্মপরায়ণতার ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপন করা। সেমতে ধর্মীয় শিক্ষার ওস্তাদ, শায়েখ, মুর্শিদ, আলিম ও আল্লাহ্ ভক্তদের প্রতি এবং সারা মুসলিম বিশ্বের মুসলমানদের প্রতি নিঃস্বার্থ মুহাব্বত পোষণ করা এর অন্তর্ভুক্ত।

لَقَدْ جِئْنٰكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ۝ اَمْ اَبْرَمُوْٓا
اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ ۝ اَمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ ۭ بَلٰى
وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ ۝ قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ ۖ فَاَنَا اَوَّلُ
الْعٰبِدِيْنَ ۝ سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝
فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ۝
وَهُوَ الَّذِيْ فِي السَّمَاۗءِ اِلٰهٌ وَّفِي الْاَرْضِ اِلٰهٌ ۭ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ۝
وَتَبٰرَكَ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَعِنْدَهٗ
عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ
مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝
وَلَىِٕنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۝ وَقِيْلِهٖ
يٰرَبِّ اِنَّ هٰٓؤُلَاۗءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلٰمٌ ۭ
فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝

(৭৮) আমি তোমাদের কাছে সত্য ধর্ম পৌঁছিয়েছি ; কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্যধর্মে নিস্পৃহ ! (৭৯) তারা কি কোন ব্যবস্থা চূড়ান্ত করেছে ? তাহলে আমিও এক ব্যবস্থা চূড়ান্ত করেছি। (৮০) তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও গোপন পরামর্শ শুনি না ? হ্যাঁ, শুনি। আমার ফেরেশতাগণ তাদের নিকটে থেকে লিপিবদ্ধ করে। (৮১) বলুন, দয়াময় আল্লাহ্‌র কোন সন্তান থাকলে আমি সর্বপ্রথম তাঁর ইবাদত করব। (৮২) তারা যা বর্ণনা করে, তা থেকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা, আরশের পালনকর্তা পবিত্র। (৮৩) অতএব তাদেরকে বাকচাতুরী ও ক্রীড়াকৌতুক করতে দিন সেই দিবসের সাক্ষাৎ পর্যন্ত, যার ওয়াদা তাদেরকে দেওয়া হয়। (৮৪) তিনিই উপাস্য নভোমণ্ডলে এবং তিনিই উপাস্য ভূমণ্ডলে। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (৮৫) বরকতময় তিনিই, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছু যাঁর। তাঁরই কাছে আছে কিয়ামতের জ্ঞান এবং তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (৮৬) তিনি ব্যতীত তারা যাদের পূজা করে, তারা সুপারিশের অধিকারী হবে না, তবে যারা সত্য স্বীকার করত ও বিশ্বাস করত। (৮৭) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তবে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ্‌। অতপর তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে ? (৮৮) রসূলের এই উক্তির কসম, হে আমার পালনকর্তা, এ সম্প্রদায় তো বিশ্বাস স্থাপন করে না। (৮৯) অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং বলুন, 'সালাম'। তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(উপরে বর্ণিত শাস্তির কারণ এই যে,) আমি (তওহীদ ও রিসালতের বিশ্বাস সম্বলিত) সত্য ধর্ম তোমাদের পৌঁছিয়েছি, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্য ধর্মের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। ("অধিকাংশ" বলার এক কারণ এই যে, কিছু লোক ভবিষ্যতে বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিল। দ্বিতীয় কারণ, যথার্থ অর্থে কিছু লোকেই ঘৃণা পোষণ করত, আর কিছু লোক দেখাদেখি সত্য ধর্মের প্রতি বিমুখ ছিল। এই ঘৃণা রসূলের বিরোধিতা ও তওহীদের বিরোধিতা উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপক। অতপর উভয়ের বিবরণ দেওয়া হয়েছে—) তারা কি (রসূলের ক্ষতিসাধনের জন্য) কোন ব্যবস্থা চূড়ান্ত করেছে ? তাহলে আমিও এক ব্যবস্থা চূড়ান্ত করেছি। (বলা বাহুল্য, আল্লাহ্‌র ব্যবস্থার সামনে তাদের ব্যবস্থা অচল। সেমতে তিনি বিপদমুক্ত থাকেন এবং তারা ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত দুরে নিহত হয়। সূরা আনফালে এর বিশদ বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। তারা কি মনে করে যে, (আপনার ক্ষতি সাধন সম্পর্কিত) তাদের গোপন কথাবার্তা ও গোপন পরামর্শ আমি শুনি না ? (যদি শুনি বলে মনে করে, তবে এরূপ দুঃসাহস কেন করবে ? অতপর তাদের এই ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে—) আমি অবশ্যই শুনি। (এছাড়া) আমার (আমল লিপিবদ্ধকারী) ফেরেশতাগণ তাদের কাছে থেকে লিপিবদ্ধ করে, (যদিও এর প্রয়োজন নেই। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী পুলিশের লিখিত রিপোর্ট বিচারকের তদন্তের চেয়ে অধিক কার্যকর হয়। অতপর তওহীদের বিরোধিতা

সম্পর্কে বলা হয়েছে—হে পয়গম্বর,) আপনি (মুশরিকদেরকে) বলুন, যদি দয়াময় আল্লাহ্‌র কোন সন্তান থাকে, তবে সর্বপ্রথম আমি তার ইবাদত করব, (যেমন, তোমরা ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্‌র কন্যা মনে করে তাদের ইবাদত কর। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তোমাদের মত সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকৃত হই না। তোমরা প্রমাণ করতে পারলে সর্বপ্রথম আমিই মেনে নেব। কিন্তু যেহেতু এটা বাতিল তাই মানব না এবং ইবাদতও করব না। অতপর শিরক থেকে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করা হয়েছে।) তারা (মুশরিকরা তাঁর সম্পর্কে) যা বর্ণনা করে, তা থেকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের এবং আরশের পালনকর্তা পবিত্র। তারা যখন সত্য ফুটে উঠার পরও হঠকারিতা ও ঔদ্ধত্য থেকে বিরত হয় না, তখন) তাদেরকে বাকচাতুরী ও ক্রীড়া-কৌতুক করতে দিন সেই দিবসের সাক্ষাৎ পর্যন্ত, যার ওয়াদা তাদেরকে দেওয়া হয়। (তখন সব স্বরূপ ফুটে উঠবে। 'করতে দেওয়ার' অর্থ প্রচার না করা নয়; বরং অর্থ এই যে, তাদের বিরোধিতার দিকে ভ্রূক্ষেপ করবেন না এবং তাদের ঈমান না আনার কারণে দুঃখিত হবেন না।) তিনিই উপাস্য নভোমণ্ডলে এবং তিনিই উপাস্য ভূমণ্ডলে। তিনি প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ। (প্রজ্ঞা ও জ্ঞানে তাঁর কোন শরীক নেই। সুতরাং উপাস্যও তিনিই)। তিনিই মহান নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছু যার। (তার জ্ঞান এমন পরিপূর্ণ যে,) কিয়ামতের খবরও তাঁর কাছে রয়েছে, (যা কোন সৃষ্টিই জানে না। শাস্তি ও প্রতিদানের মালিকও তিনিই। সেমতে) তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে (এবং হিসাব দেবে। তখন তিনি যে একাই শাস্তি ও প্রতিদানের মালিক, তা এমন স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে,) আল্লাহ্‌ ব্যতীত তারা যাদের পূজা করে, তারা সুপারিশের (-ও) অধিকারী হবে না। তবে যারা সত্য কথা (অর্থাৎ ঈমানের কালিমা) স্বীকার করেছে এবং (তা মনে-প্রাণে) বিশ্বাস করেছে, (তারা আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে মু'মিনদের জন্য সুপারিশ করতে পারবে। কিন্তু এতে কাফিরদের কি লাভ! তারা যে তওহীদে মতভেদ করে তার প্রাথমিক প্রমাণগুলো তো তারাও স্বীকার করে। সে মতে) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে তাদেরকে (অর্থাৎ তোমাদেরকে) সৃষ্টি করেছে, তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্‌ (সৃষ্টি করেছেন।) অতপর (ইবাদতের যোগ্য তিনিই হতে পারেন। সুতরাং) তারা (প্রাথমিক প্রমাণ মেনে নেওয়ার পর প্রকৃত কাম্য বিষয় মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে কোথায় ফিরে যাচ্ছে (খোদাই জানেন!) (এসব বিষয় থেকেই জানা যায়, কাফিরদের অপরাধ কত গুরুতর। কাজেই শাস্তিও অবশ্যই গুরুতর হবে। অতপর একে জোরদার করার জন্য বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা যেমন কিয়ামতের খবর রাখেন, তেমনি) তিনি রসূলের এ উক্তিরও খবর রাখেন। হে আমার পালনকর্তা, তারা (আমার এত উপদেশদান সত্ত্বেও) বিশ্বাস স্থাপন করে না। (এতে রসূলের নালিশও এসে গেছে। কাজেই শাস্তি আরও গুরুতর হবে। তাদের পরিমাণ যখন আপনি জেনে গেলেন, তখন) আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন (অর্থাৎ তাদের ঈমানের এমন আশা করবেন না, যা পরে দুঃখের কারণ হয়।) এবং (তারা যদি আপনার অনিষ্ট করতে চায়, তবে আপনি অনিষ্ট দূর করার জন্য) বলুন, আমি তোমাদেরকে সালাম করি। (আর কিছু বলি না এবং সম্পর্ক রাখি না।

অতপর সান্ত্বনার জন্য আল্লাহ্ বলেন, আপনি কিছু দিন সবর করুন।) তারা শীঘ্রই (অর্থাৎ মৃত্যুর পরেই) জানতে পারবে (তাদের কৃতকর্মের পরিণতি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ---(যদি রহমান আল্লাহ্র কোন সন্তান থাকত, তবে আমিই সর্বপ্রথম তার ইবাদত করতাম।) এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর সন্তান হওয়া কোন পর্যায়ে সম্ভব। বরং উদ্দেশ্য একথা ব্যক্ত করা যে, আমি কোন শত্রুতা ও হঠকারিতাবশত তোমাদের বিশ্বাস অস্বীকার করছি না; বরং প্রমাণাদির আলোকেই করছি। বিশুদ্ধ প্রমাণাদি দ্বারা আল্লাহ্র সন্তান থাকা প্রমাণিত হলে আমি অবশ্যই তা মেনে নিতাম। কিন্তু সর্বপ্রকার দলীল এর বিপক্ষে। কাজেই মেনে নেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। এ থেকে জানা গেল যে, মিথ্যাপন্থীদের সাথে বিতর্কের সময় নিজের সত্যপ্রিয়তা ফুটানোর উদ্দেশ্যে একথা বলা জায়েয ও সমীচীন যে, তোমার দাবি সত্য প্রমাণিত হলে আমি মেনে নিতাম। কেননা মাঝে মাঝে এ ধরনের কথায় প্রতিপক্ষের মনে নম্রতা সৃষ্টি হয়, যা তাকে সত্য গ্রহণে উৎসাহিত করে।

وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ---এ বাক্যটি অবতারণার উদ্দেশ্য কাফিরদের উপর গযব নাযিল হওয়ার যে বহুবিধ গুরুতর কারণ বিদ্যমান রয়েছে, তা ব্যক্ত করা। একদিকে তাদের অপরাধ এমনিতেই গুরুতর, অপরদিকে "রহমতুল্লিল-আলামীন" ও "শফীউল মুযনিবীন" রূপে প্রেরিত রসূল (সা) স্বয়ং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন এবং বলেছেন যে, তারা বারবার বলা সত্ত্বেও বিশ্বাস স্থাপন করে না। এখন অনুমান করা যায় যে, তারা রসূল (সা)-এর উপর কি পরিমাণ নির্যাতন চালিয়েছে। মামুলী কষ্ট পেয়ে রহমতুল্লিল আলামীন (সা) আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এমন বেদনামিশ্রিত অভিযোগ করতেন না। এ তফসীর অনুযায়ী وَقِيلِهِ এর এক আয়াত পূর্বে السَّاعَةُ শব্দের উপর معطوف হয়েছে। এ আয়াতের আরও কয়েকটি তফসীর করা হয়েছে। উদাহরণত وَاو অক্ষরটি কসমের অর্থ বোঝায় এবং إِنَّ هٰؤُلَاءِ কসমের জওয়াব। এসব তফসীর রূহুল মা'আনীতে দ্রষ্টব্য।

وَقُلْ سَلَامٌ---পরিশেষে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, বিরোধীদের দলীল ও আপত্তির জওয়াব দিন, কিন্তু তারা অজ্ঞতা ও মূর্খতা প্রদর্শনে কিংবা দুর্নাম রটনায় প্রবৃত্ত হলে তার জওয়াব তাদের ভাষায় না দিয়ে নিশ্চুপ থাকুন। "সালাম বলুন"-এর অর্থ আসসালামু

আলাইকুম বলা নয়। কেননা কোন অমুসলিমকে এই ভাষায় সালাম করা বৈধ নয়। বরং এটা এক বাকপদ্ধতি। কারও সাথে সম্পর্কছেদ করতে হলে বলা হয়, "আমার পক্ষ থেকে সালাম" অথবা "তোমাকে সালাম করি।" এতে সত্যিকারভাবে সালাম উদ্দেশ্য থাকে না, বরং উদ্দেশ্য এই যে, আমি সুন্দরভাবে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাই। কাজেই এ আয়াত দ্বারা কাফিরদেরকে سلام عليكم বলা অথবা سلام বলা বৈধ প্রতিপন্ন করা অসঙ্গত।—(রূহুল মা'আনী)

سورة الدخان

সূরা দুখান

মক্কায় অবতীর্ণ, ৫৯ আয়াত, ৩ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ۝١ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝٢ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا
كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ۝٣ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ۝٤ اَمْرًا مِّنْ
عِنْدِنَا ۭ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ۝٥ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۭ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ
الْعَلِيْمُ ۝٦ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۭ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ۝٧
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۭ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَاۗىِٕكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ۝٨
بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ يَّلْعَبُوْنَ ۝٩

(১) হা-মীম, (২) শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের, (৩) আমি একে নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে, নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। (৪) এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়। (৫) আমার পক্ষ থেকে আদেশক্রমে, আমিই রাসূল প্রেরণকারী (৬) আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৭) যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে দেখতে পাবে ; তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা। (৮) তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন। তিনি তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদেরও পালনকর্তা, (৯) এতদসত্ত্বেও এরা সন্দেহে পতিত হয়ে ক্রীড়া-কৌতুক করছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হা-মীম-(এর অর্থ আল্লাহ্ জানেন।) কসম সুস্পষ্ট কিতাবের, আমি একে (লওহে-মাহফুয থেকে দুনিয়ার আকাশে) এক বরকতের রাত্রিতে নাযিল করেছি,

(অর্থাৎ শবে-কদরে। কেননা) আমি (অনুকম্পার কারণে নিজের ইচ্ছায় আমার বান্দাদেরকে) সতর্ককারী ছিলাম। (অর্থাৎ আমার ইচ্ছা ছিল যে, বান্দাদেরকে ক্ষতির কবল থেকে বাঁচানোর জন্য তাদেরকে ভাল ও মন্দ সম্পর্কে অবহিত করে দেই। এটা ছিল কোরআন নাযিল করার উদ্দেশ্য। অতপর শবে-কদরের বরকত ও উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে।) এ রাত্রিতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাময় বিষয় আমার পক্ষ থেকে আদেশক্রমে স্থিরীকৃত হয়। (অর্থাৎ সারা বছরের প্রজ্ঞাময় বিষয়সমূহ কিভাবে আনজাম দেওয়া হবে, আল্লাহ্ তা স্থির করে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে সোপর্দ করেন। কোরআন অবতরণও সর্বাধিক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় ছিল। তাই এর জন্য এ রাত্রিকেই বেছে নেওয়া হয়। কোরআন নাযিল করার কারণ এই যে,) আমি আপনার পালনকর্তার রহমতের কারণে আপনাকে রসূল রূপে প্রেরণকারী ছিলাম, (যাতে আপনার মাধ্যমে বান্দাদেরকে অবহিত করে দেই)। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (তাই বান্দাদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখেন)। তাদের বিশ্বাস থাকলে দেখতে পেতো তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা। (তওহীদে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য এগুলো পর্যাপ্ত প্রমাণ। অতপর স্পষ্টরূপে তওহীদ বর্ণিত হয়েছে।) তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই জীবন হরণ করেন। তিনি তোমাদের পালনকর্তা ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের পালনকর্তা (এরপর তাদের মেনে নেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তবুও তারা মানেনি) বরং তারা (তওহীদের মত সত্য বিষয়ে) সন্দেহে পতিত হয়ে (দুনিয়ায়) ক্রীড়া-কৌতুকে লিপ্ত রয়েছে। (পরকালের চিন্তা করে না। ফলে সত্যান্বেষণ করে না ও এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে না)।

সূরার ফযীলত ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি জুম'আর রাত্রিতে সূরা দুখান পাঠ করে, সকাল হওয়ার আগেই তার গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। হযরত আবূ উমামার রেওয়ায়েতে আছে, যে ব্যক্তি জুম'আর রাত্রিতে অথবা দিনে সূরা দুখান পাঠ করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে গৃহ নির্মাণ করবেন।—(কুরতুবী)

উল্লিখিত আয়াতসমূহে কোরআনের মাহাত্ম্য ও কতিপয় বিষয়ে গুণ বর্ণিত হয়েছে

كِتَابٍ مُّبِيْنٍ (সুস্পষ্ট কিতাব) বলে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কসম করে বলেছেন, আমি একে এক মোবারক রাত্রিতে নাযিল করেছি এবং এর উদ্দেশ্য গাফিল মানুষকে সতর্ক করা।

لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ—অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এখানে শবে-কদর বোঝানো হয়েছে, যা রমযান মাসের শেষ দশকে হয়। এ রাত্রিকে 'মোবারক' বলার কারণ এই যে, এ রাত্রিতে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে অসংখ্য কল্যাণ ও বরকত নাযিল হয়।

সূরা কদরে إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ—আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, কোরআন পাক শবে-কদরে নাযিল হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, এখানেও বরকতের রাত্রি বলে শবে-কদরকেই বোঝানো হয়েছে। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) আরও বলেন, দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বরগণের প্রতি যত কিতাব নাযিল করেছেন, তা সবই রমযান মাসেরই বিভিন্ন তারিখে নাযিল হয়েছে। হযরত কাতাদাহ বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহীফাসমূহ রমযানের প্রথম তারিখে, তওরাত ছয় তারিখে, যবুর বার তারিখে, ইঞ্জীল আঠার তারিখে এবং কোরআন পাক চব্বিশ তারিখ অতিবাহিত হওয়ার পর পঁচিশের রাত্রিতে অবতীর্ণ হয়েছে।—(কুরতুবী)

কোরআন শবে-কদরে নাযিল হয়েছে, এর অর্থ এই যে, লওহে-মাহফুয থেকে সমগ্র কোরআন দুনিয়ার আকাশে এ রাত্রিতেই নাযিল করা হয়েছে। অতপর তেইশ বছরে অল্প অল্প করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি নাযিল হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, প্রতি বছর যতটুকু কোরআনের অবতরণ অবধারিত ছিল, ততটুকুই শবে-কদরে দুনিয়ার আকাশে নাযিল করা হত।—(কুরতুবী)

ইকরিমাহ প্রমুখ কয়েকজন তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে, এ আয়াতে বরকতের রাত্রি বলে শবে বরাত অর্থাৎ শাবান মাসের পনের তারিখের রাত্রি বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এ রাত্রিতে কোরআন অবতরণ কোরআন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনার পরিপন্থী।

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ এবং شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-এর ন্যায় সুস্পষ্ট বর্ণনা সত্ত্বেও বলা যায় না যে, কোরআন শবে বরাতে নাযিল হয়েছে। তবে কোন কোন রেওয়ায়েতে শা'বানের পনের তারিখকে শবে বরাত অথবা 'লায়লাতুস্‌সফ' নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং এর বরকতময় হওয়া ও এতে রহমত নাযিল হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে কোন কোন রেওয়ায়েতে এখানে উল্লিখিত গুণও বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا—এ রাত্রিতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা আমার পক্ষ থেকে করা হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এর অর্থ কোরআন অবতরণের রাত্রি অর্থাৎ শবে কদরে সৃষ্টি সম্পর্কিত সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা স্থির করা হয়, যা পরবর্তী শবে কদর পর্যন্ত এক বছরে সংঘটিত হবে। অর্থাৎ এ বছর কারা কারা জন্মগ্রহণ করবে, কে কে মারা যাবে এবং এ বছর কি পরিমাণ রিযিক দেওয়া হবে। মাহ্‌দভী

বলেন, এর অর্থ এই যে, আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত তকদীরে পূর্বাহ্নে স্থিরীকৃত সকল ফয়সালা এ রাত্রিতে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে অর্পণ করা হয়। কেননা কোরআন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা এসব ফয়সালা মানুষের জন্মের পূর্বেই সৃষ্টিলগ্নে লিখে দিয়েছেন। অতএব এ রাত্রিতে এগুলো স্থির করার অর্থ এই যে, যে ফেরেশতাগণের মাধ্যমে ফয়সালা ও তকদীর প্রয়োগ করা হয়, এ রাত্রিতে সারা বছরের বিধানাবলী তাদের কাছে অর্পণ করা হয়।—(কুরতুবী)

কোন কোন রেওয়ায়েতে শবে বরাত সম্পর্কেও বলা হয়েছে যে, এতে জন্ম-মৃত্যুর সময় ও রিযিকের ফয়সালা লেখা হয়। এ থেকেই কেউ কেউ আলোচ্য আয়াতে 'বরকতের রাত্রি'র অর্থ নিয়েছেন শবে-বরাত। কিন্তু এটা শুদ্ধ নয়। কেননা, এখানে সর্বাগ্রে কোরআন অবতরণের উল্লেখ রয়েছে এবং কোরআন অবতরণ যে রমযান মাসে হয়েছে, তা কোরআনের বর্ণনা দ্বারাই প্রমাণিত। শবে বরাত সম্পর্কিত উল্লিখিত কোন কোন রেওয়ায়েতকে ইবনে কাসীর অগ্রাহ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং কাযী আবূ বকর ইবনে আরাবী সংশ্লিষ্ট বর্ণনাগুলি নির্ভরযোগ্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন। ইবনে আরাবী শবে বরাতের ফযীলত স্বীকার করেন না। তবে কোন কোন মাশায়েখ দুর্বল হলেও হাদীসগুলোকে কবুল করেছেন। কেননা ফযীলত সম্পর্কিত দুর্বল রেওয়ায়েত কবুল করার অবকাশ রয়েছে।

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾ يَغْشَى النَّاسَ ۖ هَٰذَا
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١﴾ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ أَنَّىٰ
لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا
مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ﴿١٤﴾ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ
﴿١٥﴾ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ ۚ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿١٦﴾

(১০) অতএব আপনি সেই দিনের অপেক্ষা করুন, যখন আকাশ ধোঁয়ায় ছেয়ে যাবে, (১১) যা মানুষকে ঘিরে ফেলবে। এটা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১২) হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের উপর থেকে শাস্তি প্রত্যাহার করুন, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করছি। (১৩) তাঁরা কি করে বুঝবে, অথচ তাদের কাছে এসেছিলেন স্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল (১৪) অতপর তারা তাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এবং বলে, সে তো উন্মাদ—শিখানো কথা বলে। (১৫) আমি তোমাদের উপর থেকে আযাব কিছুটা প্রত্যাহার করব, কিন্তু

তোমরা পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। (১৬) যে দিন আমি প্রবলভাবে ধৃত করব, সেদিন পুরাপুরি প্রতিশোধ গ্রহণ করবই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(তারা সত্য সুস্পষ্ট হওয়ার পরেও মানে না,) অতএব আপনি তাদের জন্য সে দিনের অপেক্ষা করুন, যখন আকাশ ধূম্রাচ্ছন্ন হবে। এটাও এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। [এখানে দুর্ভিক্ষ বোঝানো হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বদ-দোয়ার ফলে মক্কা-বাসীরা এ দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছিল। এ বদ-দোয়া একবার মক্কায় ও একবার মদীনায় হয়েছিল। ক্ষুধার তীব্রতায় ও মাটির শুষ্কতায় আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে ধোঁয়ার মত দৃষ্টিগোচর হয়। তা-ই এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। দুর্ভিক্ষের কারণে মক্কাবাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে কাকুতি-মিনতি শুরু করে দেয়। সেমতে ভবিষ্যদ্বাণীরূপে বলা হয়েছে যে, মক্কাবাসীরা তখন আল্লাহ্র সকাশে আরয করবে,] হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের থেকে এ আযাব সরিয়ে নিন, আমরা অবশ্যই বিশ্বাস স্থাপন করব। [এ ভবিষ্যদ্বাণী এভাবে পূর্ণ হয় যে, আবূ সুফিয়ান ও অন্যান্য কুরায়েশ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে চিঠি লিখে এবং নিজেরাও এসে দোয়ার অনুরোধ করে। ইয়ামামার সরদার সুমামা তাদের খাদ্যশস্য সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছিল, তাকেও বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে। রূহুল মা'আনীতে আবূ সুফিয়ানের ঈমানের ওয়াদাও বর্ণিত রয়েছে। অতপর বলা হয়েছে যে, তাদের ওয়াদা খাঁটি মনে ছিল না।] তারা কি করে উপদেশ লাভ করবে যদ্দ্বারা তাদের ঈমান আশা করা যায়, অথচ (ইতিপূর্বে) তাদের কাছে সুস্পষ্ট পয়গম্বর আগমন করেছেন (অর্থাৎ যাঁর নবুয়ত সুস্পষ্ট ছিল)। অতপর তারা তাঁকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে এবং বলেছে, সে তো (অন্য লোকের) শিখানো বুলি বলে (এবং) সে উন্মাদ। (সুতরাং এরপরও যখন তারা বিশ্বাস স্থাপন করল না, তখন দুর্ভিক্ষে কিরূপে ঈমান আশা করা যায়। দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে তো অবিবেচকরা একথাও বলতে পারে যে, এটা স্বাভাবিক ঘটনা, যা বোধগম্য কারণে সংঘটিত হয়েছে—কুফরের শাস্তি নয়। সুতরাং তাদের ওয়াদা কেবল উপস্থিত বিপদ টলানোর জন্য।) আমি (নিরুত্তর করার জন্য) কিছুদিন আযাব প্রত্যাহার করব, কিন্তু তোমরা পুনরায় তোমাদের প্রথমাবস্থায় ফিরে যাবে। [এ ভবিষ্যদ্বাণী এভাবে পূর্ণ হয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দোয়ার ফলে বৃষ্টি হয় এবং ইয়ামামার সরদারকে চিঠি লিখে খাদ্যশস্যের সরবরাহ পুনরায় চালু করা হলে মক্কাবাসীরা স্বস্তি লাভ করে। কিন্তু ঈমান দূরের কথা, তাদের নম্রতাও বিদায় নেয় এবং তারা পূর্ববৎ ঔদ্ধত্য প্রদর্শন আরম্ভ করে। 'কয়েকদিন' বলার অর্থ এই যে, এ আযাবের অপসারণকাল পার্থিব জীবন পর্যন্তই সীমিত। মৃত্যুর পর যে আযাব আসবে, তার অবসান হবে না। সেমতে ইরশাদ হয়েছে,] যেদিন আমি প্রবলভাবে পাকড়াও করব, (সেদিন) আমি (পুরোপুরি) প্রতিশোধ নেবই (অর্থাৎ পরকালে পুরোপুরি শাস্তি হবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে উল্লিখিত ধোঁয়া সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের তিন প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে। প্রথম উক্তি এই যে, এটা কিয়ামতের অন্যতম আলামত যা কিয়ামতের সন্নিকটবর্তী সময়ে সংঘটিত হবে। এই উক্তি হযরত আলী, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, আবূ হুরায়রা (রা), হাসান বসরী (র) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এ ভবিষ্যদ্বাণী অতীতে পূর্ণ হয়ে গেছে এবং এতে মক্কার সে দুর্ভিক্ষ বোঝানো হয়েছে, যা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বদ-দোয়ার ফলে মক্কা-বাসীদের উপর আপতিত হয়েছিল। তারা ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল এবং মৃত জন্তু পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল। আকাশে বৃষ্টি ও মেঘের পরিবর্তে ধূম্র দৃষ্টি-গোচর হত। এ উক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) প্রমুখের। তৃতীয় উক্তি এই যে, এখানে মক্কা বিজয়ের দিন মক্কার আকাশে উত্থিত ধূলিকণাকে ধূম্র বলা হয়েছে। এ উক্তি আবদুর রহমান আরাজ প্রমুখের। —(কুরতুবী) প্রথমোক্ত উক্তিদ্বয়ই সমধিক প্রসিদ্ধ। তৃতীয় উক্তি ইবনে কাসীরের মতে অগ্রাহ্য। সহীহ্ হাদীসসমূহে দ্বিতীয় উক্তিই অবলম্বিত হয়েছে। প্রথমোক্ত উক্তিদ্বয়ের রেওয়ায়েত নিম্নরূপ ঃ

সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েতে হুযায়ফা ইবনে উসায়েদ বলেন, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) উপর তলার কক্ষ থেকে আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। আমরা তখন পরস্পর কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন, যত দিন তোমরা দশটি আলামত না দেখ, ততদিন কিয়ামত হবে না—(১) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, (২) দুখান তথা ধূম্র, (৩) দাব্বা, (৪) ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব, (৫) ঈসা (আ)-র অবতরণ, (৬) দাজ্জালের আবির্ভাব, (৭) পূর্বে ভূমিধস, (৮) পশ্চিমে ভূমিধস, (৯) আরব উপদ্বীপে ভূমিধস, (১০) আদন থেকে এক অগ্নি বের হবে এবং মানুষকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। মানুষ যেখানে রাত্রি যাপন করতে আসবে, অগ্নিও থেমে যাবে, যেখানে দুপুরে বিশ্রামের জন্য আসবে, সেখানে অগ্নিও থেমে যাবে। —(ইবনে কাসীর)

আবূ মালিক আশ'আরী বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি তোমা-দেরকে তিন বিষয়ে সতর্ক করছি—এক. ধূম্র, যা মু'মিনকে কেবল এক প্রকার সর্দিতে আক্রান্ত করে দেবে এবং কাফিরের দেহে প্রবেশ করে প্রতিটি রন্ধ্রপথে বের হতে থাকবে। দুই. দাব্বা (ভূগর্ভ থেকে নির্গত অদ্ভুত জানোয়ার) এবং তিন. দাজ্জাল। ইবনে কাসীর এমনি ধরনের আরও কয়েকটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে লিখেন ঃ

هذا اسناد صحيح الى ابن عباس خبر الامة و ترجمان القران و هذا قول من و افقه من الصحابة و التا بعين مع الا حاديث المرفوعة من الصحاح و الحسان و غيرهما التى اوردوها مما فيه مقنع و دلالة ظاهرة على ان الدخان من الايات المنتظرة مع انه ظاهر القرآن فا رتقب

يوم تاتى السماء بدخان مبين - وعلى ما فسره ابن مسعود انما هو خيال رأوه فى اعينهم من شدة الجوع والجهد وهكذا قوله تعالى يغشى الناس اى يتغشاهم ويعمهم ولو كان امرا خياليا يخص اهل مكة لمشركين لما قيل فيه يغشى الناس -

কোরআনের তফসীরকার হযরত ইবনে আব্বাস (রা) পর্যন্ত এই সনদ বিশুদ্ধ। অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীর উক্তিও তাই, তারা ইবনে আব্বাসের সঙ্গে একমত হয়েছেন। এছাড়া কিছু সহীহ্ ও হাসান হাদীসও একথা প্রমাণ করে যে, 'দুখান' বা ধূম্র কিয়ামতের ভবিষ্যৎ আলামতসমূহের অন্যতম। কোরআনের বাহ্যিক ভাষাও এর সাক্ষ্য দেয়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের তফসীরে উল্লিখিত ধূম্র একটি কাল্পনিক ধূম্র ছিল, যা ক্ষুধার তীব্রতার কারণে তাদের চোখে প্রতিভাত হয়েছিল। এর জন্য 'মানুষকে ঘিরে নেবে' কথাটি অবান্তর মনে হয়। কেননা, এই কাল্পনিক ধূম্র মক্কাবাসীদের মধ্যেই সীমিত ছিল। অথচ يغشى الناس থেকে বোঝা যায় যে, এটা সব মানুষকে ব্যাপকভাবে ঘিরে ফেলবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের উক্তির রেওয়ায়েত বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ইত্যাদি কিতাবে হযরত মসরূকের বাচনিক বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একদিন আমরা আবওয়াবে কেন্দার নিকটবর্তী কূফার মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম, জনৈক ওয়ায়েয ওয়াজ করছেন। তিনি يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ —আয়াত সম্পর্কে শ্রোতাদেরকে প্রশ্ন করলেন, এই দুখানের কি অর্থ, আপনারা জানেন? অতপর নিজেই বললেন, এটা এক ধূম্র, যা কিয়ামতের দিন নির্গত হবে এবং মুনাফিকদের কর্ণ ও চক্ষু নষ্ট করে দেবে। পক্ষান্তরে মু'মিনদের মধ্যে এর কারণে কেবলমাত্র সর্দির উপসর্গ সৃষ্টি হবে।

মসরূক বলেন, ওয়ায়েযের এ কথা শুনে আমরা আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের কাছে গেলাম। তিনি শায়িত ছিলেন—ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উঠে বসলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের নবী (সা)-কে এই পথনির্দেশ দিয়েছেন ঃ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ —অর্থাৎ আমি তোমাদের কাছে আমার সেবাকর্মের কোন বিনিময় চাই না এবং আমি কোন কথা বানিয়ে বলি না। কাজেই যে আলিম হবে, সে যা জানে না, তা পরিষ্কার বলে দেবে, আমি জানি না; আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। নিজে কোন কথা বানিয়ে বলা উচিত নয়। অতপর তিনি বললেন, এখন আমি তোমাদেরকে এ আয়াতের তফসীর সম্পর্কিত ঘটনা শোনাই।

কাফিররা যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকার করল এবং কুফুরীকেই আঁকড়ে রইল, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের জন্য বদ-দোয়া করলেন যে, হে আল্লাহ্, এদের উপর ইউসুফ (আ)-এর আমলের দুর্ভিক্ষের ন্যায় দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দিন। ফলে কাফিররা ভয়ংকর দুর্ভিক্ষে পতিত হল। এমনকি, তারা অস্থি এবং মৃত জন্তুও ভক্ষণ করতে লাগল। তারা আকাশের দিকে তাকালে ধূম্র ব্যতীত কিছুই তাদের দৃষ্টিগোচর হত না। এক রেওয়ায়েতে আছে, তাদের কেউ আকাশের দিকে তাকালে ক্ষুধার তীব্রতায় সে কেবল ধূম্রের মত দেখত। অতপর আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ তাঁর বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ —আয়াতখানি তিলাওয়াত করলেন। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জনগণ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আবেদন করল, আপনি আপনার মুযার গোত্রের জন্য আল্লাহ্র কাছে বৃষ্টির দোয়া করুন! নতুবা আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাব। রসূলুল্লাহ্ (সা) দোয়া করলে, বৃষ্টি হল। তখন إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ আয়াত নাযিল হল। অর্থাৎ আমি কিছু দিনের জন্য তোমাদের থেকে আযাব প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। কিন্তু তোমরা বিপদমুক্ত হয়ে গেলে আবার কুফরের দিকে যাবে। বাস্তবে তা-ই হল, তারা তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে গেল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ —আয়াত নাযিল করলেন। অর্থাৎ যেদিন আমি প্রবলভাবে পাকড়াও করব, সেদিনের ভয় কর। অতপর ইবনে মসউদ বললেন, এই প্রবল পাকড়াও বদর যুদ্ধে হয়ে গেছে। এই ঘটনা বর্ণনা করার পর তিনি আরও বললেন, পাঁচটি বিষয় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। অর্থাৎ দুখান তথা ধূম্র, রোম, চাঁদ, পাকড়াও ও লেযাম।—(ইবনে কাসীর) দুখান অর্থ মক্কার দুর্ভিক্ষ। রোম অর্থ সেই ভবিষ্যদ্বাণী যা সূরা রূমে রোমকদের বিষয় সম্পর্কে বর্ণিত আছে وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ —চন্দ্র অর্থ চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, যা اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। পাকড়াও অর্থ বদর যুদ্ধে কুরাইশ-কাফিরদের পরিণতি। লেযাম অর্থে فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।